উম্মাহর নেতাদের প্রয়োজনীয় গুনাবলী

সংকলন ও বিন্যাস

শায়খ ইসমাঈল ইবনে আব্দুর রহীম
'আবু হাফ্স আলমাকদিসি'

উৎসর্গ

এই কিতাবটি উৎসর্গ করছিঃ

- আগ্রাসনের কালো থাবা ও স্বৈরাচারি শাসনব্যবস্থার জুলুম থেকে মুক্তিকামী মুসলিম উম্মাহর প্রতি। যে শাসনব্যবস্থা মুসলিম উম্মাহকে রাব্বুল আলামিনের শরীয়ত থেকে দূরে রেখেছে।
- আমার সম্মানিত পিতা-মাতার প্রতি। আল্লাহ তাদের প্রতি রহম করুন এবং তাদেরকে সুউচ্চ জান্নাতুল ফিরদাউসে আবাস দান করুন!
- ঐ সকল ভাগ্যাহত বন্দীদের প্রতি, যারা জীবনের শ্রেষ্ঠ মূহুর্তগুলো তাগুতদের কারাগারসমূহে অতিবাহিত করছেন।
- আল্লাহর পথে দাওয়াত ও কিতালের ভূমিসমূহে অবস্থানকারী সকল মুজাহিদ ও মুরাবিতদের প্রতি, বিশেষতঃ দখলকৃত মসজিদে আকসার মুরাবিতীনের প্রতি!
- ঐ সকল জিহাদী শায়খ ও আলেমদের প্রতি, যারা সম্মানের মুকুট, পৃথিবীর অপরিহার্য অঙ্গ।
- উম্মাহর সেনাবাহিনীর ঐ সকল ভাইদের প্রতি! যারা কষ্টের উপর অবিচল রয়েছেন এবং নিকটের-দূরের সকলের অত্যাচার সহ্য করে যাচ্ছেন।
- আমার স্ত্রীর প্রতি, যিনি আমার সঙ্গে একসাথে জেলখানা, সফর ও চিকিৎসার কষ্ট-কাঠিন্য সহ্য করেছেন.. আমার পুত্র, কণ্যা, ভাই, বোন, পরিবার ও চাচা-চাচিদের প্রতি।
- শহীদদের পিতা মাতা ও স্ত্রী-সন্তানদের প্রতি! আহত উম্মাহর জখমী ও শোকসন্তপ্তদের প্রতি।
- আমার উপর অধিকার রাখে, এমন সকলের প্রতি।

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক, অসহায়দের সাহায্যকারী, তাওহীদবাদীদের সম্মানিতকারী এবং কাফের ও মুনাফিকদের প্রতি কঠোরতাকারী। দরূদ ও সালাম তাওহীদবাদীদের ইমাম ও মুজাহিদদের নেতার প্রতি এবং তার পরিবারবর্গ, সাহাবা ও কিয়ামত পর্যন্ত যারা তার নির্দেশিত পথে চলবে তাদের প্রতি।

নিশ্চয়ই সর্বাধিক সত্যবাণী আল্লাহর কিতাব এবং সর্বোত্তম পথ নবী মুস্তফা ﷺ এর পথ। **অত:পর:**

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা তার নবী-রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছেন স্ব স্ব কওমকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে আসার জন্য। মিথ্যা, জুলুম ও অত্যাচারের অন্ধকার থেকে ইনসাফ, দয়া, উত্তম চরিত্র ও উন্নত সামাজিক মূল্যবোধের দিকে নিয়ে আসার জন্য।

যেমনটা রিবয়ী ইবনে আমের রা: বলেছেন:

> "আমরা এমন সম্প্রদায়, আমাদেরকে আল্লাহ পাঠিয়েছেন বান্দাদেরকে বান্দাদের দাসত্ব থেকে বের করে বান্দার রবের দাসত্বের দিকে নিয়ে আসার জন্য, সকল ধর্মের জুলুম থেকে ইসলামের ইনসাফের দিকে নিয়ে আসার জন্য, দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে দুনিয়া ও আখিরাতের প্রশস্ততার দিকে নিয়ে আসার জন্য।"

(ইবনে কাসীর রহ: আলবিদায়া ওয়াননিহায়ায় ইহা উল্লেখ করেছেন। এর সনদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে।)

এগুলো অল্প কিছু কথা, কিন্তু এর অর্থ ব্যাপক। কারণ এতে তিনি সেই মহান দায়িত্বের কথা উল্লেখ করেছেন, যা আল্লাহ তা'আলা আখিরী উম্মাহর উপর অর্পণ করেছেন। আর তিনি এই উম্মাহর জন্য যে পথ নির্ধারণ করলেন তা হচ্ছে "মানুষকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে আসা"।

এবার আমরা দেখি, আমাদের অবস্থা কি?

আমরা তো দেখছি, আমাদের উম্মাহর অনেক লোক সে পথ থেকে বের হয়ে গেছে, ফলে তারা নিজেরাও বক্র হয়েছে, অন্যদেরকে বক্রপথে নিয়েছে এবং ধোঁকা, জুলুম ও অত্যাচারে লিপ্ত হয়েছে।

আল্লাহ তার নবী মুহাম্মদ ﷺ কে এমন এক যুগে প্রেরণ করেছেন, যে যুগ দেখেছে এমন জুলুম, পথভ্রষ্টতা ও শিরক, যার উপমা পৃথিবী কখনো দেখেনি এবং দেখবেও না। সেই মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ ﷺ ধরাধামে আগমন করলেন ইসলামের বার্তা, তাওহীদের নূর ও হেদায়াত নিয়ে। ঈমানী বন্ধনের ভিত্তিসমূহ স্থাপন করার জন্য।

তিনি ﷺ ভ্রান্ত চিন্তাধারাগুলোকে সঠিক করলেন। সমাজকে পথভ্রষ্টতা, অজ্ঞতা, জুলুম ও মূর্খতার অন্ধকার থেকে ইনসাফ, দয়া ও সাম্যের দিকে নিয়ে আসলেন, যাতে কোন আরবীর জন্য অনারবীর উপর তাকওয়া ছাড়া কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। ফলে এটা সেই মর্যাদাকর বিষয়ে পরিণত হল, যার ব্যাপারে সমস্ত সৃষ্টি প্রতিযোগীতা করবে, তথা তাকওয়া, আল্লাহর নৈকট্য ও তার সরল দ্বীনের শিক্ষাসমূহ বাস্তবায়ন।

এর মাধ্যমেই নবী ﷺ তার সাহাবীদেরকে সর্বিকভাবে চূড়ান্ত ও পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা দিলেন। যার মধ্যে রয়েছে নেতৃত্বের দিকও।

একারণেই ইতিহাস আজও পর্যন্ত তাদের মত নেতৃত্বদানকারী ও পরিচালনাকারী দেখেনি। আর এমনটা হবে না কেন? তারা তো আদম সন্তানের সর্দার, সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী নবীর হাতে শিক্ষা লাভ করেছেন।

নবী ﷺ এর নেতৃত্ব ছিল প্রকৃত অর্থেই অতুলনীয় নেতৃত্ব। তার নেতৃত্বের প্রশংসা করার মত কি যোগ্যতাই বা আমার আছে?

তিনি রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ নেতৃত্বের ভিত্তিকে এমন একটি কাঠামোর উপর দাঁড় করাতে সক্ষম হয়েছিলেন, যার বর্ণনা কোন মানুষ দিতে অক্ষম। ফলে স্বল্প দিনের মধ্যে সর্বপ্রকার আভ্যন্তরীণ কোন্দল মিটিয়ে ফেললেন। তাঁর সমাজকে এমন আদর্শ ও সুসভ্য সমাজ রূপে গড়ে তুললেন, যা সামাজিক উৎকর্ষতার সর্বোচ্চ স্তর লাভ করেছিল। অনুরূপই ছিল তার বহিঃরাজনীতিও।

তিনি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার ইচ্ছানুযায়ী কিছু গোত্রের সাথে মিত্রতা গঠন করলেন এবং কিছু গোত্রের প্রতি কোমলতা প্রদর্শন করলেন। তিনি বিভিন্ন রাজা-বাদশাহদের নিকট প্রেরিত তার দূতদেরকে খুব গুরুত্বের সাথে মনোনীত করতেন।

তাই আমর ইবনে আস রাঃ কে আম্মানের বাদশার প্রতি দূত হিসাবে মনোনীত করলেন। হাতিব ইবনে আবি বালতাআ রাঃ কে মিশরের বাদশা মুকাওকিসের প্রতি দূত হিসাবে মনোনীত করলেন। নিজের জন্য একটি আংটি বানালেন, যেন তার যুগের অন্যান্য বাদশাহদের সাথে মিল রাখতে পারেন।

তিনি ﷺ যখন মদীনার বাইরে যেতেন, তখন মদীনার কার্যাদী পরিচালনার জন্য তার সাহাবীদের মধ্যে কাউকে শাসক বানাতেন। এই ধারাবাহিকতায় একবার আলী রা:কে শাসক বানালেন, একবার উসমান রা:কে শাসক বানালেন।

তিনি বিভিন্ন ক্ষুদ্র দল বা বড় বাহিনীর জন্য উদ্দিষ্ট শহর বা কওমের বংশ বিবেচনা পূর্বক এবং নিজ সাহাবাদের যোগ্যতার ব্যাপারে স্বীয় ধারণার আলোকে কোন উপযুক্ত লোককে আমির বানাতেন। এজন্য একবার আমির বানিয়েছিলেন আবু বকরকে, একবার আলীকে, আবার কখনো আমর ইবনুল আসকে, খালিদ ইবনুল ওয়ালিদকে, আবু উবায়দা ইবনুল জার্রাহকে বা উসামা ইবনে যায়দকে (অথচ তিনি বয়সে অনেক ছোট ছিলেন)।

যে সাহাবী যে প্রাকৃতিক বিশেষ গুণের ক্ষেত্রে অন্যদের থেকে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত হতেন, তিনি তার সেই গুণটিকে আরো বাড়িয়ে তুলতেন। প্রত্যেককে সেই গুণের আলোকে কোন উপাধি দিতেন। তারপর তাকে এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিতেন, যা ঐ বৈশিষ্ট্য ও যোগ্যতার প্রতি তার আত্মবিশ্বাসকে আরো দৃঢ় করত।

হ্যাঁ, তা ছিল এমন এক শিক্ষা, যা পৃথিবী পূর্বেও কখনো দেখেনি এবং পরেও দেখবে না। যে শিক্ষা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগকে সর্বকালের সেরা যুগে পরিণত করেছিল। তাই আমি সেই যুগের যতই প্রশংসা করি, তার শ্রেষ্ঠত্ব যতই বর্ণনা করি, কখনো তা শেষ করতে পারবো না।

আজ মুসলিমদের নেতৃত্ব ঠিক সেভাবে গড়ে তোলা অতীব জরুরী, যেভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সাহাবীদেরকে গড়ে তুলেছিলেন। বিশেষতঃ যেহেতু আমরা এমন এক যামানায় নেতৃত্বশূণ্য হয়ে পড়েছি, যখন ফেৎনার ঢল ঢেউয়ের ন্যায় একটির উপর আরেকিটি আছড়ে পড়ছে।

উম্মাহ আজ এমন একজন ব্যক্তিত্বের প্রয়োজনবোধ করছে, যে তাদেরকে সেই বিভেদ, দলাদলি, হিংসা, হানাহানি, বিভ্রান্তি, মনস্তাত্বিক যুদ্ধ ও জুলুম থেকে মুক্তি দিবে, যা খেলাফতের পতন, অত:পর বৃটেন ও ফ্রান্সের হাতে সকল দেশগুলো ছোট ছোট রাজ্যে পরিণতি হওয়ার পর থেকে অধিক পরিপুষ্ট হয়েছে।

এই উম্মাহর আজ সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন এমন এক নেতৃত্বের, যে হবে প্রজ্ঞাশীল, কুরআন-সুন্নাহর আলেম। তার জাতি যে পরিস্থিতিতে এসে পৌঁছেছে তা গভীরভাবে অনুধাবন করবে। অত:পর তার বিরুদ্ধে অপরাপর জাতি-গোষ্ঠীর ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বিষয়টিকেও তার আলোকে চিন্তা করবে।

যেটা নবী ﷺ স্পষ্টভাবে বলেছেনঃ

> "অচিরেই সকল জাতি-গোষ্ঠী পরস্পরকে তোমাদের বিরুদ্ধে আহ্বান করবে, যেমন খাবার প্লেটে একজন আরেকজনকে আহ্বান করে। একজন বলল, সে দিন আমাদের সংখ্যা কম থাকার কারণে এমনটি হবে? রাসূল ﷺ বললেনঃ বরং সেদিন তোমরা অনেক বেশি থাকবে।
>
> কিন্তু তোমরা হবে স্রোতে প্রবাহমান আবর্জনার ন্যায়। আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের অন্তর থেকে তোমাদের ভয় উঠিয়ে নিবেন আর তোমাদের অন্তরে ওয়াহ্‌ন ঢেলে দিবেন। একজন বলল, হে আল্লাহর রাসূল! ওয়াহ্‌ন কি? তিনি বললেনঃ দুনিয়ার ভালবাসা ও মৃত্যুকে অপছন্দ করা"।
>
> (বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমাদ ও আবু দাউদ। শায়খ আলবানী তাকে সহীহ বলেছেন।)

এই নেতৃত্বের আবশ্যকীয় দায়িত্ব হল উম্মাহর প্রতিটি সদস্য, দল ও অঞ্চলকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করা।

সুস্পষ্ট রাজনৈতিক ভাষণ প্রদান, উম্মাহর বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন উন্নয়নশীল কর্মসূচি বাস্তবায়ন, বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা, যত বেশি সম্ভব উলামা, চিন্তাবিদ, রাজনৈতিক ও জিহাদী নেতৃবৃন্দকে একত্রিত করা এবং এমন অনেক সত্যনিষ্ঠ ও আমানতদার প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার মাধ্যমে, যারা আল্লাহর কিতাব ও রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নাহর আলোকে এমন একটি সংবিধান প্রণয়ন করবে, জীবনের সকল বিষয়ে যার থেকে সমাধান নেওয়া হবে।

যে সকল বিষয় বুঝা কখনো কখনো কারো জন্য কঠিন হয়ে পড়ে, সেগুলোতে উম্মাহর পূর্বসূরীদের বুঝের দিকে প্রত্যাবর্তন করা হবে। যেন সর্ববিষয়ে পূর্ণাঙ্গ এমন একটি শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়, যার লক্ষ্য হবে খেলাফত আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহ ফিরিয়ে আনা এবং 'ইনিল হুকমু ইল্লা লিল্লাহ' পুনরায় বাস্তবায়ন করা।

ইসলামে নেতৃত্বের প্রতিপালন

ইসলামে প্রতিপালনমূলক নেতৃত্ব কোন চাকুরী বা ক্ষমতা নয়। বরং এটি জীবনের একটি আদর্শ। জীবন পরিচালনার পদ্ধতি। যার চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে খেলাফত বাস্তবায়ন করা, আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা, তার আদেশগুলো পালন করা এবং তার নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ পরিত্যাগ করা।

এর দ্বারা নেতৃত্বের এই দৃষ্টিভঙ্গি আর পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গির মাঝে পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যায়। কেননা সেখানে যারা দুনিয়া-আখিরাত উভয়টার জন্য কাজ করে আর যারা শুধু দুনিয়ার জন্য কাজ করে, এই দুই শ্রেণীর মাঝে বিস্তর ব্যাবধান থাকে।

একারণে প্রত্যেক সংজ্ঞা দানকারীর দৃষ্টিভঙ্গি ও সামগ্রীক পরিবর্তনশীল উপাদানগুলোর কারণে এর সংজ্ঞার মধ্যেও পার্থক্য হবে। যেমন- পরিপার্শ্বিকতা, বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামরিক, সামাজিক, মনস্তাত্তিক ও সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহ এবং অভিষ্ট লক্ষ্যের ভিত্তিতে সংজ্ঞার মধ্যে পার্থক্য হয়।

উম্মাহর জন্য নেতৃত্ব, দেহের জন্য আত্মার ন্যায়। এটি এমন জিনিস, যা দেহকে নাড়া দেয়, তাতে আনন্দ ও প্রশান্তির অনুভূতি দেয়। এমন জিনিস, যা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে অধিক ব্যাথিত হয়। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে আনন্দ ও উচ্ছাসের অনুভূতি দেয়। তাই উম্মাহর নেতৃত্বই হচ্ছে তার দেহের প্রধান পরিচালক। নেতৃত্বই তাকে আশঙ্কাজনক বিষয় থেকে দূরে থাকার দিকনির্দেশ করে এবং দেহকে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ রক্ষণাবেক্ষণ করে। যেন উম্মাহর জীবন সর্বোত্তমভাবে পরিচালিত হয়।

রাসূল ﷺ বলেন:

> পরস্পর দয়া, ভালবাসা ও সহমর্মিতার ক্ষেত্রে মুমিনদেরকে দেখবে একটি দেহের ন্যায়, যার একটি অঙ্গ আক্রান্ত হলে তার জন্য পুরো দেহই অনিদ্রা ও জ্বরে কাটায়।
>
> (ইমাম বুখারী রহঃ সহীহ বুখারীতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।)

উম্মাহর জন্য আজ আভ্যন্তরীণ ও বহিঃরাজনীতিতে প্রজ্ঞাবান একটি নেতৃত্বের প্রয়োজন। যা প্রতিটি বিষয়কে সঠিক পরিমাণে ও সঠিক স্থানে রাখবে। যেন উম্মাহর সন্তানদের মাঝে শরয়ী শাসনব্যবস্থার প্রতি আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে পারে। যা এক শ্রেণীর অজ্ঞদের কর্মকান্ডের কারণে অনেকের কাছেই ভয়ের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

উম্মাহ প্রতীক্ষা করছে, কে তাদেরকে শত্রুদের কবল থেকে এবং উম্মাহর সাথে বিশ্বাসঘাতকতাকারী তাগুত শাসকদের কবল থেকে তাদের হারানো সম্মান ফিরিয়ে দিবে। যারা তাদেরকে যুগ যুগ ধরে শাসন করে আসছে।

উম্মাহ অনেক বেশি প্রয়োজনবোধ করছে এমন এক নেতৃত্বের, যা তাদের উপর সহনশীল হবে, তাদের প্রতি কোমল হবে, তাদের সাথে নম্রতা ও ভালবাসার আচরণ করবে এবং তাদের প্রতি দয়াশীল হবে আর তাদের শত্রুদের প্রতি হবে কঠোর।

যেমন আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা বলেন:

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ

شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

"মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল। তার সঙ্গে যারা আছে, তারা কাফেরদের বিরুদ্ধে কঠোর এবং আপসের মধ্যে একে অন্যের প্রতি দয়ার্দ্র। তুমি তাদেরকে দেখবে (কখনও) রুকুতে, (কখনও) সিজদায়, আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি সন্ধানে রত। তাদের আলামত তাদের চেহারায় পরিষ্ফুট, সিজদার ফলে।

এই হল তাদের সেই গুণাবলী, যা তাওরাতে বর্ণিত আছে। আর ইনজিলে তাদের দৃষ্টান্ত এই, যেন এক শস্যক্ষেত্র, যা তার কুঁড়ি বের করল, তারপর তাকে শক্ত করল। তারপর তা পুষ্ট হল। তারপর তা নিজ কান্ডের উপর এভাবে সোজা দাঁড়িয়ে গেল যে, তা কৃষকদেরকে মুগ্ধ করে ফেলে।

এটা এইজন্য যে, আল্লাহ তাদের (উন্নতি) দ্বারা কাফেরদের অন্তর্দাহ সৃষ্টি করেন। যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, আল্লাহ তাদেরকে মাগফিরাত ও মহা পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।" (আল-ফাত্হ ২৯)

এমন নেতৃত্ব, যা জ্ঞান-বুদ্ধির সম্মান ও মূল্যায়ন করবে; তাকে উপহাসের বস্তু বানাবে না ।

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

"(হে নবী!) তারপর আল্লাহর রহমতই ছিল, যদ্দরুন তাদের প্রতি তুমি কোমল আচরণ করেছ। তুমি যদি রূঢ় প্রকৃতির ও কঠোর হৃদয় হতে, তবে তারা তোমার আশপাশ থেকে সরে বিক্ষিপ্ত হয়ে যেত। সুতরাং তাদেরকে ক্ষমা কর, তাদের জন্য মাগফিরাতের দু'আ কর এবং (গুরুত্বপূর্ণ) বিষয়ে তাদের সাথে পরার্শ করতে থাক।

অত:পর তুমি যখন (কোন বিষয়ে) মনস্থির করবে, তখন আল্লাহর উপর নির্ভর করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওয়াক্কুলকারীদেরকে ভালবাসেন।" (আলে ইমরান:১৫৯)

সকল মানুষের সাথে কোমল আচরণ করা ইসলামের একটি উন্নত বৈশিষ্ট্য। এমন ব্যক্তিই এই গুণে গুণান্বিত হতে পারে, ঈমান যার হৃদরেয় গভীরে প্রবেশ করেছে, চেতনায় ও কর্মে দৃঢ়ভাবে স্থান করে নিয়েছে।

যে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেছে যে, কোমলতাই সৌভাগ্য, শ্রেষ্ঠত্ব ও নেতৃত্বের চাবিকাঠি। উম্মাহ আজ কতই না প্রয়োজনবোধ করে এমন একটি নেতৃত্বের, যে তাদের সাথে কোমল আচরণ করবে, তাদেরকে নতুন করে জেগে উঠতে সাহায্য করবে!!

আবুদ্দারদা রা: এর সূত্রে রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন:

> "যাকে তার কোমলতার ভাগ দেওয়া হয়েছে, তাকে তার কল্যাণের ভাগ দেওয়া হল। আর যাকে তার কোমলতার ভাগ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, তাকে তার কল্যাণের ভাগ থেকে বঞ্চিত করা হল।
>
> কিয়মাতের দিন মুমিনের পাল্লায় সবচেয়ে ভারি বস্তু হবে তার উত্তম চরিত্র।"
>
> (বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমাদ ও তিরমিযী।)

ইসলাম আমাদেরকে কোমলতার প্রতি উদ্ধুদ্ধ করেছে, তার দিকে আহ্বান করেছে ও উৎসাহিত করেছে। ইসলাম আমাদের নিকট বর্ণনা করেছে যে, যে ব্যক্তি কার্যগতভাবেই কল্যাণের প্রেমিক ও তার প্রতি আগ্রহী হয়, কোমলতার প্রভাব ও ফলাফল তাকে সকল কর্মকান্ডে কোমলতা অনুসন্ধান করতে বাধ্য করবে।

সুতরাং কোমলতা হল, সকল আমলের সৌন্দর্য্য ও ঔজ্জ্বল্য। যা তার শ্রেষ্ঠত্বের একটি রহস্যও বটে।

আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল রা: এর সূত্রে রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত:

> "নিশ্চয়ই আল্লাহ কোমল। তিনি কোমলতাকে ভালবাসেন ও পছন্দ করেন। তিনি কোমলতার প্রতিদান হিসাবে এমন বিষয় দান করেন, যা কঠোরতার দ্বারা দান করেন না। (বর্ণনা করেছেন ইমাম মুসলিম রহ:।)

আমি পূর্বে মুসলিম নেতৃত্বের গুণাবলীর সম্পর্কে একটি কিতাব লিখেছি। এখানে উক্ত কিতাবে উল্লেখিত গুণগুলোর উপর আরো দুইটি গুণ বর্ণনা করবো। গুণ দু'টি হচ্ছে: 'বীরত্ব' ও 'পরামর্শ করা'।

আল্লাহর এই মুখাপেক্ষী বান্দার অভিমত হচ্ছে, এই ন'টি গুণ হল এমন গুণ, যা একজন মুক্তিদাতা নেতার (যদি উপাধিটি সঠিক হয়ে থাকে) মাঝে বিদ্যমান থাকা অত্যন্ত জরুরী।

উক্ত গুণগুলো হচ্ছে:

العلم- الحلم- الحكمة- الحزم- الجود- الخطابة- الشجاعة- الشوري- الصدق

ইলম, সহনশীলতা, প্রজ্ঞা, দৃঢ়তা, দানশীলতা, বাগ্মিতা, বীরত্ব, পরামর্শ ও সততা।

যদিও আরো অনেক গুণাবলী রয়েছে, কিন্তু আমি মনে করি, এগুলো হচ্ছে তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই কিতাবের বাকে বাকে এসকল গুণগুলোর প্রতিটির স্বতন্ত্র বিশ্লেষণ করবো ইংশাআল্লাহ।

প্রথম গুণ: العلم (ইলম)

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

"আর বল, হে প্রভু! আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দাও"

ইলম: আভিধানিক অর্থ জানা। যেমন: বলা হয়: **علم الشيئ يعلمه علما** (সে বিষয়টির ইলম অর্জন করেছে বা করবে।) অর্থাৎ সে জেনেছে বা জানবে।

পারিভাষিক সংজ্ঞা: 'কোন জিনিসের প্রকৃত তত্ত্ব জানা'। কেউ বলেছেন, 'জ্ঞাত জিনিসের ব্যাপারে অস্পষ্টতা দূর করা'।

আর জাহ্‌ল বা অজ্ঞতা হল তার বিপরীত। কেউ বলেন, এর কোন সংজ্ঞার প্রয়োজন নেই। কেউ বলেন, 'ইলম এমন একটি প্রোথিত গুণ, যার দ্বারা সামগ্রীক ও একক বিষয়সমূহ উপলব্ধি করা যায়'।

আমরা সেই ইলমের আলোচনা দিয়ে শুরু করবে, যে ইলমের আলোচনা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা তার নবী ﷺ এর সঙ্গে কথা শুরু করেছেন-

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

"পড় তোমার প্রভুর নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।" (আলাক:১)

অন্য আয়াতে বলেছেন:

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ

"তাই জেনে রেখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। আর নিজের গুনাহর জন্য এবং মুমিন নর-নারীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। আল্লাহ তোমার গতিবিধি ও অবস্থানস্থল সম্পর্কে জানেন।" (মুহাম্মদ:১৯)

হাসান ইবনে ফযল রহ: বলেন: *'তাই তোমার ইলমের উপর আরো ইলম বৃদ্ধি কর'।*

আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ ওহীর সূচনাই হল ইলম দিয়ে। ইলম হচ্ছে একটি নূর, যার মাধ্যমে আল্লাহ তার বান্দাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন। তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসেন। যাতে তাদের জীবন তার সন্তুষ্টিমত পরিচালিত হয়।

মানুষের ইলম যত বৃদ্ধি পায়, আপন রবের প্রতি, নিজ আত্মার প্রতি এবং স্বীয় দাওয়াত সঠিক ও হক হওয়ার প্রতি তার আস্থা ও বিশ্বাস তত বৃদ্ধি পায় এবং উক্ত দাওয়াত বাস্তবায়নের জন্য দৃঢ়তার সাথে পথ চলার হিম্মতও বৃদ্ধি পায়। যেন সম্ভাব্য সর্বাধিক পরিমাণ বান্দার নিকট আল্লাহর দাওয়াত পৌঁছে যায়।

ইলম যদি ব্যাপকভাবে সবার জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ গুণ বলে গণ্য নাও হয়, তথাপি একজন মুসলিম নেতার জন্য অত্যাবশ্যকীয় গুণগুলোর মধ্যে ইলম সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

এটা অন্যান্য গুণগুলোর সাথেও জড়িত। কেননা কিছু গুণ রয়েছে, যেগুলো ইলম ছাড়া অস্তিত্বেই আসতে পারে না। যেমন সহনশীলতা। এটা ইলমের সাথে পরিমিত হওয়া অনিবার্য। এমনিভাবে দৃঢ়তা ও বীরত্বের গুণদ্বয়ও। এমনিভাবে প্রতিটি গুণই কোনও না কোনভাবে ইলমের সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং ইলম হল সকল গুণগুলোর উৎস ও ভিত্তি। একজন নেতা এক মুহূর্তের জন্যও এ গুণটি হতে অমুখাপেক্ষী থাকতে পারে না।

তাই আল্লাহ তা'আলা তাকে যে স্থানে অধিষ্ঠিত করেছেন এবং যে গুরুদায়িত্ব তাকে দিয়েছেন, সে দায়িত্বের জন্য যতটুকু ইলম প্রয়োজন, ততটুকু ইলম অর্জন করা তার উপর ফরজ। আর এই ইলম অর্জন করা হবে আল্লাহর কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদিস থেকে। এবং সবশেষে সঠিক উৎস হতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনাচার অনুসন্ধানের মাধ্যমে।

এছাড়া বিভিন্ন ঘটনায় রাসূল ﷺ বা সাহাবীদের আমল সম্পর্কে অবগত হওয়া, তাতে চিন্তা করা, অত:পর আমাদের যামানায় তার অনুরূপ ঘটনাবলীকে তার সাথে কিয়াস করার মাধ্যমেও সমাধান লাভ করা যায়। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। কারণ ইলমের বিষয়টি আরও ব্যাপক। শুধু এগুলোর উপরই ক্ষান্ত থাকা সঠিক নয়।

কারণ অনেক সময় আমাদের যামানায় এমন বিষয় সংঘটিত হয়, যার অনুরূপ ঘটনার ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ বা সাহাবাগণের অবস্থান দেখলে মনে হয়, আমাদের যামানায় এর থেকে ভিন্নটা উত্তম।

স্পষ্ট করার জন্য বলি: কখনো কোন লোক কোন একটি ঘটনায় কঠোর আচরণ অবলম্বন করার পক্ষে রাসূল ﷺ এর এমন একটি ঘটনা দিয়ে দলিল দিল, যাতে রাসূল ﷺ কঠোর আচরণ অবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু লোকটি উক্ত ঘটনার সময় বোঝেনি। কারণ রাসূল ﷺ কঠোর আচরণ অবলম্বন করেছিলেন মদীনায় হিজরতের পরে।

পক্ষান্তরে মক্কায় থাকাকালে এমন ঘটনার ক্ষেত্রে 'ক্ষমা ও মার্জনা'ই ছিল তার একমাত্র কথা। এবং সাহাবায়ে কেরামকেও এরই আদেশ দিতেন। আর উক্ত হুকুমটি আমাদের বর্তমান যামানায় আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ কারো নিকট অস্পষ্ট নয় যে, বর্তমানে শাসন ও ক্ষমতা অমুসলিমদের হাতে।

যা একটা সীমা পর্যন্ত রাসূল ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামের মক্কার অবস্থার সাথে সাদৃশ্য রাখে। রাসূল ﷺ সে সময় অন্যায়কে বাঁধা দেওয়ার ক্ষেত্রে কঠোরতা অবলম্বন করতেন না। আমি যা জানি, তাতে এরকম কোন ঘটনা নেই যে, রাসূল ﷺ যুদ্ধের ময়দান ছাড়া কোন কাফেরকে হত্যা করেছেন বা শাস্তি দিয়েছেন।

যাই হোক, মক্কী জীবনে রাসূল ﷺ শুধু আল্লাহর দিকে আহ্বান করতেন আর ক্ষমা করে যেতেন। অর্থাৎ সে সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ এর একমাত্র কাজ ছিল তার রবের দ্বীনের দাওয়াত দেওয়া, যেহেতু তখন মুসলিমগণ ছিলেন দুর্বল। যাতে কাফেররা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পক্ষ থেকে পরিপূর্ণ দলিল পেয়ে যায় এবং পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে তাদের নিকট অপছন্দনীয় বিষয়গুলো দেখলে তার ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে না পড়ে। অর্থাৎ তাদের অহংকার ও জুলুমের কারণে যেগুলোকে অপছন্দ করে।

আমাদের বর্তমান অবস্থাটিও ঠিক অনুরূপ। কেননা বর্তমানে এমন অনেক অমুসলিম রয়েছে, যাদের ইসলামের ব্যাপারে কোন জ্ঞান নেই, চাই পাশ্চাত্যের হোক বা আমাদের সমাজের খৃষ্টানরাই হোক। এমনকি অনেক মুসলিমও এমন রয়েছে। এক্ষেত্রে ইসলামের বিশুদ্ধ নিদর্শনগুলো থেকে যে যত দূরে, তার অজ্ঞতার পরিমাণও সে স্তরের।

একারণে এখন যদি 'নাহি আনিল মুনকার' করতেই হয়, তাহলে নম্রতা থেকে ধাপে ধাপে কঠোরতার দিকে যেতে হবে। অত:পর এই নম্রতার কথা সমস্ত সৃষ্টির কর্ণকুহরে ও দৃষ্টির সামনে এমনভাবে পৌছে দিতে হবে, যেমনিভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মক্কায় মানুষকে দাওয়াত দিয়েছিলেন, তখন নিকটের-দূরের প্রতিটি গোত্রই মুশরিকদের প্রতি রাসূল ﷺ এর ক্ষমা ও মার্জনার বিষয়ে ব্যাপকভাবে জেনে গিয়েছিল।

কিন্তু এর বিপরীত করলে এই দ্বীনকে বিকৃতভাবে চিত্রায়িত করা হবে। যা বর্তমানে হয়েছেও। 'সন্ত্রাস ও কট্টরপন্থী' তকমা গায়ে লেগেছে। এমনকি যখনই তাদের আলোচনা সামনে আসে, তখনই এই চিত্রটি ভেসে উঠে। আর এটা শুধু সেই অজ্ঞতার কারণে, যা-নিজেদেরকে উম্মাহর নেতৃত্বদানের অধিকারী দাবিকারী- কিছু লোককে এমন কাজে লিপ্ত করিয়েছে, যা মানুষকে আল্লাহর দ্বীন ও তার শরীয়ত বাস্তবায়নের ব্যাপারে বীতশ্রদ্ধ করে দিয়েছে।

সুতরাং এ বিষয়টাকে উপদেশ গ্রহণের দৃষ্টিতে দেখা উচিত। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ হুদুদ কায়েম করা ও হত্যাযোগ্য লোকদেরকে হত্যা করার কাজ তখনই শুরু করেছেন, যখন কাফেররা ও অন্য সবাই এই দ্বীনের ব্যাপারে পূর্ণ দলিল পেয়ে গিয়েছিল।

এমনকি তারা একথাও জেনে গিয়েছিল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দয়া, তার কঠোরতার উপর প্রবল এবং তার নিকট কঠোরতা থেকে দয়া ও করুণাই অধিক প্রিয়। ফলে তিনি যখন মদীনায় কঠোরতার আচরণ গ্রহণ করলেন, তখন কাফেরদের কোন ছোট প্রমাণও অবশিষ্ট রইল না।

এমন পরিবেশ তিনি একদিনে বা একরাতে প্রস্তুত করেননি। ইমাম সারাখসী রহ: বলেন: জিহাদ ও কিতালের আদেশ পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথমে শুধু রিসালাত পৌছানো আর কাফেরদেরকে এড়িয়ে চলতে আদিষ্ট ছিলেন। তারপর উত্তম পন্থায় বিতর্ক করার আদেশ পান। তারপর যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়। তারপর যুদ্ধের আদেশ করা হয়, যদি কাফেরদের পক্ষ থেকে যুদ্ধের সূচনা হয়। তারপর তাদেরকে হারাম মাস সমূহ অতিক্রম করার শর্তে কিতালের আদেশ দেওয়া হয়। তারপর ব্যাপকভাবে যুদ্ধের আদেশ দেওয়া হয়।

আমি এ বিষয়ে আলোচনা দীর্ঘায়িত করলাম। কারণ, আপনারা জেনেছেন, আমাদের দেশগুলোতে এমন কর্মকান্ড শুরু হয়েছে, যেগুলোকে ইসলামী মনে করা হয়, অথচ ইসলাম এগুলো থেকে মুক্ত। একারণেই মুসলিম নেতৃত্বের উপর আবশ্যক ছিল সর্বদা ইলম অর্জনের চেষ্টা করা এবং রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডে নির্ভরযোগ্য, হেদায়াতপ্রাপ্ত ও সত্যবাদী আলেমদের থেকে পরামর্শ নেওয়া। যেন উম্মাহকে উন্নতির দিকে নিয়ে যেতে পারেন, বিভ্রান্তির গোলকধাঁধা থেকে স্পষ্ট সত্যের আলোতে নিয়ে আসতে পারেন।

উপরন্তু তার এরূপ দলিলের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে, যার দ্বারা তিনি তার বিরুদ্ধাবাদী বাতিলপন্থিদের বিরুদ্ধে প্রমাণ পেশ করতে পারেন। এমনিভাবে তার কর্তব্য হবে, প্রজাদেরকে ইলমে অর্জনে উৎসাহিত করা, এরজন্য অনেক ইলমী মারকায ও বিশ্ববিদ্যালয় খোলা.. .. ..ইত্যাদি।

আর শাসক নিজেই তালিবুল ইলমদের ব্যয়ভার বহন করা, তাদের জন্য নিয়মতান্ত্রিক ভাতা ধার্য করা, যা তাদেরকে প্রাত্যহিক জীবনে সহযোগীতা করবে, আলেমদেরকে তাদের মর্যাদা অনুযায়ী মূল্যায়ন করা, তা'লীমে নিয়োজিতদের জন্য ভাতা নির্ধারণ করা, বহির্দেশ থেকে আলেমদেরকে আমন্ত্রণ জানানো ইত্যাদি তার অত্যাবশ্যকীয় দায়িত্ব। যেন এর মাধ্যমে ইলম প্রসার লাভ করে এবং মুসলিম শহরগুলো ইলমের সৌরভে সুরভিত হয়, উন্নতি লাভ করে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা ও তার রাসূল ﷺ মুসলিমদেরকে ইলম অন্বেষণ করতে ও আলেমদের অনুসরণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। আল্লাহ ইরশাদ করেছেন:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

"মুসলিমদের পক্ষে এটাও সমীচীন নয় যে, তারা (সর্বদা) সকলে এক সঙ্গে (জিহাদে) বের হয়ে যাবে। একটি অংশ কেন বের হয় না, যাতে (যারা জিহাদে যায়নি) তারা দ্বীনের উপলব্ধি অর্জনের চেষ্টা করে এবং সতর্ক করে তাদের কওম (-এর সেই সবলোক)কে, যারা জিহাদে গিয়েছে, যখন তারা তাদের কাছে ফিরে আসবে, ফলে তারা (গুনাহ থেকে) সতর্ক থাকবে।" (তাওবা:১২২)

আবুদ্দারদা রা: থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি,

“যে ইলম অন্বেষণের উদ্দেশ্যে পথ চলে, আল্লাহ তা’আলা তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন। আর ফেরেশতাগণ ইলম অন্বেষণকারীদের জন্য তাদের ডানাসমূহ বিছিয়ে দেন। আলিমের জন্য আকাশ ও যমীনের অধিবাসীরা-এমনকি সমুদ্রের মাছও- ক্ষমা প্রার্থনা করে।

আবিদের উপর আলিমের শ্রেষ্ঠত্ব হল, তারকারাজীর উপর চন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্বের ন্যায়। নিশ্চয়ই নবীগণ দিনার বা দিরহামের উত্তরাধিকারী বানান না; বরং তারা ইলমের উত্তরাধিকারী বানান। তাই যে এটা গ্রহণ করল, সে ই পূর্ণ অংশ গ্রহণ করল”। (বর্ণনা করেছেন ইমাম আবু দাউদ ও তিরমিযী)

মুআবিয়া রাঃ বর্ণনা করেছেন, নবী ﷺ বলেনঃ

“আল্লাহ যার ব্যাপারে কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের বুঝ দান করেন”। (বর্ণনা করেছেন ইমাম বুখারী ও মুসলিম)

ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহঃ বলেনঃ

“এটা প্রমাণ করে, যাকে তিনি দ্বীনের ফিকহ বা বুঝ দান করেননি, তার ব্যাপারে কল্যাণের ইচ্ছা করেননি। আর যাকে দ্বীনের বুঝ দান করেছেন, তার ব্যাপারে কল্যাণের ইচ্ছা করেছেন। তবে তখন ফিকহ দ্বারা উদ্দেশ্য হবে এমন ইলম, যার অনিবার্য ফল হচ্ছে আমল।

কিন্তু যদি তার দ্বারা নিছক ইলম উদ্দেশ্য হয়, তখন এটা একথা প্রমাণ করবে না যে, যে দ্বীনি বুঝ অর্জন করেছে, তার ব্যাপারে কল্যাণের ইচ্ছা করা হয়েছে। কারণ তখন কল্যাণের ইচ্ছা করার জন্য দ্বীনি বুঝ থাকা হবে শর্ত। আর প্রথমোক্ত অবস্থায় তা হবে ফল। আল্লাহ ই ভাল জানেন।”

ইবনে বাত্তাল রহঃ বলেনঃ

“এর মধ্যে সকল মানুষের উপর আলেমদের শ্রেষ্ঠ হওয়ার এবং অন্য সকল ইলমের উপর দ্বীনি ফিকহ শ্রেষ্ঠ হওয়ার প্রমাণ রয়েছে। আর এর শ্রেষ্ঠ হওয়ার কারণ হল, যেহেতু এটা আল্লাহ তা’আলাকে ভয় করতে, তার আনুগত্যে অটল থাকতে ও তার অবাধ্যতা থেকে দূরে থাকতে সাহায্য করে।

তাই ইলমের দ্বারাই সমস্ত ইবাদত বিশুদ্ধ ও উপযুক্ত হয়, আর তা না হলে প্রত্যেকের অবস্থানুযায়ী ত্রুটি হতে থাকে। এমনকি কখনো তা গুনায় পরিণত হয়। ইলমের দ্বারা জাতি উন্নতি লাভ করে আর ইলম ছাড়া পতিত হয়। আর উম্মাহর নেতৃবৃন্দই উক্ত ইলমের সবচেয়ে বেশি মুখাপেক্ষী।”

রাসূল ﷺ এক হাদিসে এমনটিই বর্ণনা করেছেন, যা বর্ণনা করেছেন হযরত আবুদ্দারদা রাঃ, রাসূলুল্লাহ বলেছেনঃ

“নিশ্চয়ই আলেমগণ নবীদের ওয়ারিশ। আর নিশ্চয়ই নবীগণ দিনার বা দিরহামের উত্তরাধিকারী বানিয়ে যান না। বরং তারা ইলমের উত্তরাধিকারী বানান। তাই যে তা গ্রহণ করল, সে পূর্ণ অংশ গ্রহণ করল।”

ইলম অর্জন শুধু শরয়ী ইলম পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়। বরং এটা যেকোন কারিগরি, প্রযুক্তিগত, সামরিক ও অন্যান্য ইলমকেও অন্তর্ভূক্ত করে।

আনাস ইবনে মালেক রাঃ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেনঃ

“ইলম অন্বেষণ করা প্রতিটি মুসলিমের উপর ফরজ।”

(বর্ণনা করেছেন ইমাম বায়হাকি রহ। শায়খ আলবানী তার ‘সহীহুল জামে’ কিতাবে এর বিশুদ্ধতা বর্ণনা করেছেন।)

ইমাম বাইহাকী রহঃ বলেনঃ

“উদ্দেশ্য হচ্ছে এমন ইলম, যা কোন সুস্থ মস্তিস্ক ও প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির অজানা থাকার অবকাশ নেই। অথবা এমন জিনিসের ইলম, যা শুধু তার সামনে উপস্থিত হয়।

সে এটা সম্পর্কে জিজ্ঞাস করে জেনে নিবে। অথবা উদ্দেশ্য হচ্ছে, যতক্ষণ পর্যন্ত যথেষ্ট পরিমাণ লোক এই দায়িত্ব পালন না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরজ। আল্লাহই ভাল জানেন।"

ইলম ও আলেমদের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে আরও বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট দুই ব্যক্তির আলোচনা করা হল: তাদের একজন আবিদ (শুধু ইবাদতকারী), অপরজন (ইবাদতকারী) আলিম।

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

"আবিদের উপর আলিমের শ্রেষ্ঠত্ব হল তোমাদের সবচেয়ে নিম্নস্তরের লোকের উপর আমার শ্রেষ্ঠত্বের মত।"

অত:পর রাসূল ﷺ বলেন:

"নিশ্চয়ই আল্লাহ, তার ফেরেশতাগণ এবং আসমান ও যমীনবাসীগণ-এমনকি গর্তের পিপিলিকা ও সমুদ্রের মাছ পর্যন্ত- ঐ ব্যক্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, যে মানুষকে কল্যাণ শিক্ষা দেয়।"

ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ: বলেন:

"যেহেতু তার প্রদত্ত শিক্ষাটিই তাদের মুক্তি, সৌভাগ্য ও আত্মশুদ্ধির কারণ হবে, একারণে আল্লাহ তা'আলা তাকেও অনুরূপ আমলের সাওয়াব দিবেন। আর তা এভাবে যে- তিনি তার সালাত, ফেরেশতাদের সালাত ও যমীনবাসীদের সালাত থেকে একটি অংশ তার জন্য নির্ধারণ করবেন, যা তার মুক্তি, সৌভাগ্য ও সফলতার কারণ হবে।

কারণ যেমনিভাবে মানুষকে কল্যাণ শিক্ষা দাতা আল্লাহর দ্বীন ও তার বিধি-বিধানকে প্রকাশকারী এবং মানুষের নিকট আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর পরিচয় দানকারী, অনুরূপ আল্লাহ তা'আলাও নিজের সালাত, আসমানবাসীদের সালাত ও যমীনবাসীদের সালাত তার জন্য নিয়োজিত করবেন, যার ফলে আসমান ও যমীনবাসীদের মাঝে তার প্রশংসা, সম্মান ও স্তুতি গাওয়া হবে।"

ইমাম বদরুদ্দীন ইবনে জামাআহ রহ: বলেন:

"জেনে রাখুন! ঐ ব্যক্তির মর্যাদার চেয়ে উচ্চ মর্যাদা কিছু হতে পারে না, যার জন্য দু'আ ও ক্ষমা প্রার্থনায় ফেরেশতাগণ ও অন্যান্য মাখলুকগণ নিয়োজিত হন এবং তার জন্য তাদের ডানা বিছিয়ে দেন।"

একজন নেককার ব্যক্তি বা যার ব্যাপারে সালিহ হওয়ার ধারণা করা হয়, তার থেকে দু'আ নেওয়ার ব্যাপারেই মানুষ প্রতিযোগীতা করে, তাহলে ফেরেশতাদের দু'আর বিষয়টি কত মর্যাদাপূর্ণ!

ফেরেশতাদের ডানা বিছানোর অর্থ কি? এ ব্যাপারে বিভিন্ন মত রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন এর অর্থ হল, তার জন্য বিনয়ী হওয়া। কেউ বলেছেন, তার নিকট আসা ও তার সাথে উপস্থিত হওয়া। কেউ বলেছেন, তাকে সম্মান করা। কেউ বলেছেন, এর অর্থ হল, ফেরেশতাগণ তাকে ডানার উপর বহন করে, অত:পর তাকে গন্তব্যে পৌঁছতে সাহায্য করে।

আর পশুপাখিকে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনার বুঝ দেওয়ার কারণ হিসাবে কেউ কেউ বলেছেন: প্রথমত: যেহেতু এগুলোকে সৃষ্টিই করা হয়েছে মানুষের কল্যাণ ও সুবিধার জন্য। উপরন্তু আলেমগণই এগুলোর মধ্যে কোনটি হালাল, কোনটি হারাম, তা বর্ণনা করেন এবং এদের প্রতি দয়া করার ও এদের ক্ষতি না করার উপদেশ দেন।

দ্বিতীয় গুণ: الحلم (সহনশীলতা)

"হে রব! আমার সম্প্রদায়কে ক্ষমা করে দাও; তারা জানে না।"

(বর্ণনা করেছেন ইমাম বুখারী ও মুসলিম রহ:)

'আল-হিলমু' এর আভিধানিক অর্থ 'ধীরস্থিরতা'। তার থেকে حلم (হালুমা), ح বর্ণ পেশযুগে।

অর্থ: সে সহনশীল হল। تحلم (তাহাল্লামা) অর্থ সহনশীলতা প্রদর্শন করল। আর تحالم অর্থ: এমন ব্যক্তি, যে নিজের মধ্যে সহনশীতা দেখালো, অথচ এটা তার মাঝে নেই।

আর পরিভাষায় 'হিলম' হল, যে আপনার প্রতি জুলুম করে, তাকে আপনার পক্ষ থেকে ক্ষমা করে দেওয়া এবং মন্দের জবাব ভালোর দ্বারা দেওয়া। আর কেউ বলেন, হিলম হল, তীব্র ক্রোধের সময় প্রশান্ত থাকা।

এর গুরুত্বও প্রথমটি থেকে কম নয়। তাই একজন মুসলিম নেতার অবশ্যই এই গুণে গুণান্বিত হতে হবে। যাতে তার সহনশীলতা ক্রোধের উপর, নম্রতা কঠোরতার উপর এবং ক্ষমা শাস্তির উপর বিজয়ী হয়।

এই গুণে গুণান্বিত হওয়ার ফলাফলগুলো চিন্তা করলে আমাদের নিকট এর গুরুত্বটি স্পষ্ট হবে। তাই এর ফলাফলগুলো নিম্নে প্রদত্ত হল:

১। নেতার মাঝে মামুরদের ভালোবাসা সৃষ্টি করে। কোনো কোনো মহলে ধারণা করা হয় যে, এটা তার ভয় ও গাম্ভীর্য কমিয়ে দেয়, কিন্তু এই ধারণা ভুল।

কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কওমের পক্ষ থেকে সীমাহীন কষ্ট ও কঠোরতা সহ্য করা সত্ত্বেও তাদের প্রতি সর্বোচ্চ সহনশীলতা ও দয়া প্রদর্শন করেছিলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হল, আপনার কি ওহুদের দিনের চেয়ে কঠিন দিন কোনটি অতিবাহিত হয়েছে?

> তিনি বললেন, "আমি তোমার কওম থেকে যার সম্মুখীন হয়েছি, তা কতই না কঠিন ছিল। আমি তাদের থেকে সর্বাধিক কঠিন যে অবস্থার শিকার হয়েছি, তা হল আকাবার দিনে। আমি আব্দে ইয়ালীল ইবনে আব্দে কুলালের ছেলের নিকট নিজেকে উপস্থাপন করি। আমি তার থেকে যা চাইলাম, সে তাতে সাড়া দিল না।
>
> তাই আমি ফিরে চললাম। আমি তখন খুব বিষন্ন চেহারায় ছিলাম। কিন্তু তারপর আমি শুধু এতটুকু মনে করতে পারি যে, আমি কতগুলো শিয়ালের খপ্পরে পড়েছিলাম। অত:পর আমি মাথা তুলে দেখি, আমি একখন্ড মেঘের নীচে, যা আমাকে ছায়া দিয়ে রেখেছে। আমি তাকিয়ে দেখলাম, সেখানে জিবরাঈল উপস্থিত। তিনি আমাকে ডাক দিয়ে বললেন: আপনার কওম আপনাকে যে জবাব দিয়েছে ও যা বলেছে, আল্লাহ তা শুনেছেন। তাই আল্লাহ আপনার নিকট পাহাড়ের ফেরেশতাকে পাঠিয়েছেন, আপনি তাদের ব্যাপারে তাকে যেকোন আদেশ করতে পারেন।
>
> অত:পর পাহাড়ের ফেরেশতা আমাকে ডাক দিয়ে সালাম দিয়ে বলল, হে মুহাম্মদ! এটা আপনার ইচ্ছা; আপনি যদি চান, তবে আমি তাদের উপর দুই পাহাড়কে চাপিয়ে দিব। তখন নবী ﷺ বললেন: বরং আমি আশাবাদী, আল্লাহ তাদের বংশধরদের থেকে এমন লোক বের করবেন, যারা আল্লাহর ইবাদত করবে। তার সাথে কাউকে শরীক করবে না।" (বর্ণনা করেছেন ইমাম বুখারী রহ:)

হযরত আনাস ইবনে মালেক রা: থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন:

> আমি রাসূল ﷺ এর সাথে চলছিলাম। তার গায়ে একটি নাজরানী চাদর ছিল। যার প্রান্তগুলো ছিল মোটা। অগত্যা এক গ্রাম্য লোক এসে তার চাদর ধরে তাকে এত জোরে টান দিল যে, আমি দেখলাম, সজোরে টান দেওয়ার ফলে চাদরের কোণা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাঁধের উপর দাগ সৃষ্টি করে ফেলেছে।

তারপর উক্ত লোকটি বলল, আল্লাহ তোমাকে যে মাল দিয়েছে, তার থেকে কিছু আমাকে দিতে আদেশ কর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। অত:পর তাকে দান করতে আদেশ করলেন। (বর্ণনা করেছেন ইমাম বুখারী ও মুসলিম রহ:)

মুসলিম নেতার পরিপূর্ণ চেষ্টা থাকতে হবে তার প্রজাদের ব্যাপারে এই গুণ অবলম্বন করার এবং তাকে এটাও বিবেচনায় রাখতে হবে যে, মানুষ সংকীর্ণ জীবন-যাপনের কারণে দু:খ-কষ্ট ও মানসিক নিপীড়নের শিকার, যা অনেক সময় তাদের থেকে মন্দ কর্মকান্ড ও আচরণ প্রকাশ করতে পারে।

২। নেতার ভুল হলে ভুল ধরিয়ে দেওয়ার মত সাহস হয়। আর এটা বলা বাহুল্য যে, উম্মাহর শক্তিকে কেন্দ্রীভূত রাখতে এর ভূমিকা অপরিসীম। কারণ, শাসক যখন স্বীয় সহনশীলতার দ্বারা প্রতিটি মুসলিমকে উম্মাহর ভবিষ্যৎ নির্ধারণে অংশগ্রহণের সুযোগ দিবেন, তখন এটা প্রতিটি মুসলিমের মাঝে স্বীয় উম্মাহর প্রতি দায়িত্বশীলতা ও উম্মাহর সাথে নিজের সম্পৃক্ততার অনুভূতি বৃদ্ধি করবে।

কিন্তু এর বিপরীত হল, নেতা যদি এর বিপরীত গুণের অধিকারী হয়, তাহলে তা প্রজাদের অন্তরে ঘৃণা ও ভয়ের বীজ বপন করবে। যা বর্ণিত বিষয়গুলোতে তাদের ভূমিকাকে পদপিষ্ট করবে। ফলে এটা অনেক নেতিবাচক ফলাফল বয়ে আনবে। এমনকি সবশেষে বিদ্রোহও সৃষ্টি করতে পারে।

আমরা বিগত শতাব্দীতে উম্মাহর শাসকদের থেকে দেখেছি, তারা উম্মাহকে কর্তৃত্বাধীন রাখার নামে নিজ জনগণের প্রতি বিভিন্নমুখী আগ্রাসন ও কঠোরতা করেছে, যা কোন মুসলিমের নিকটই অস্পষ্ট নয়। কিন্তু ঐ সকল লোকগুলো জানেনি যে, এই আগ্রাসনই তাদের আশংকাকে তরান্বিত করবে।

৩। দলে দলে মানুষ আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করার সব চেয়ে বড় মাধ্যম। একারণেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা এমন কোন নবী প্রেরণ করেননি, যিনি বকরী চড়াননি। যেহেতু বকরী শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে চলে না; বরং মন যে দিকে নিয়ে যায় সে দিকেই যায়। একজন রাখাল এতে যে কষ্টের সম্মুখীন হয়, তা তার সহনশীলতা বৃদ্ধি করে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: **"সর্বনিকৃষ্ট রাখাল হল নির্যাতনকারী। তাই তুমি তাদের অন্তর্ভূক্ত হওয়া থেকে বেঁচে থাক।" (বর্ণনা করেছেন ইমাম মুসলিম রহ:)**

অনেক রাখাল আছে, যাদের মাঝে সহনশীলতা নেই। এ ধরণের রাখালকে দেখবেন, যখনই তার কোন একটি বকরী এদিক ওদিক যায় বা বিশৃঙ্খল হয়ে যায় বা দূরে চলে যায়, সে বকরীটিকে পেলে মাথায় তুলে সজোরে যমীনে আছাড় মারে। যদি সকল রাখালরাই তার মত করত, তাহলে নিশ্চয়ই অল্প সময়ের মধ্যেই সব বকরী শেষ হয়ে যেত। এ হল একটি বকরীর পালের রাখালের উদাহরণ।

তাহলে যে ব্যক্তি লক্ষ লক্ষ মানুষকে দেখাশোনা করে, তার অবস্থা কেমন হবে বলে ধারণা করতে পারি?! আমরা দেখতে পাই, একেক জন শাসকের একেক রকম চিন্তা ভাবনা ও ইচ্ছা আকাঙ্খা, বিশেষত: আমাদের যুগে, যে যুগ বহু চিন্তা ও বহু মতবাদ অবলোকন করছে।

সুতরাং এমতাবস্থায় অবশ্যই দায়িত্বশীলকে এমন সহনশীল ও প্রশস্তহৃদয় হতে হবে, যার ফলে সে সমাজকে এমন কাঠামোতে পরিচালনা করতে পারে, যা মানুষের জন্য সম্মানজনক জীবনে নিশ্চয়তা প্রদান করে; তাদের প্রতি কষ্ট আরোপ করে না। বিশেষত: এখন তো উম্মাহ এমন এক নেতৃত্বের প্রয়োজন বোধ করছে, যে তাদের হাল ধরবে।

আমরা আজ সবচেয়ে বেশি এমন একটি সহনশীল নেতৃত্বের মুখাপেক্ষী, যে নেতৃত্ব উম্মাহকে পরিচালনা করবে, তাদের শান্তির জন্য কাজ করবে এবং তাদের বিরুদ্ধবাদীদের উপর আমাদের শরীয়তের নির্দেশ বাস্তবায়ন করবে; নিজ প্রবৃত্তির নির্দেশে বাস্তবায়ন করবে না।

৪। শত্রুতাকে ভালবাসায় রূপান্তরিত করে।

আল্লাহ সুবহানাহু বলছেন:

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (৩৪) وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ

“ভাল ও মন্দ সমান হয় না। তুমি মন্দকে প্রতিহত কর এমন পন্থায়, যা হবে উৎকৃষ্ট। ফলে যার ও তোমার মধ্যে শত্রুতা ছিল, সে সহসাই হয়ে যাবে তোমার বন্ধু। আর এ গুণ কেবল তাদেরকেই দান করা হয়, যারা সবর করে এবং এ গুণ কেবল তাদেরকেই দান করা হয়, যারা মহাভাগ্যবান।” (ফুস্‌সিলাত:৩৪,৩৫)

এমন আয়াত অনেক রয়েছে, যেগুলো মুসলমানদেরকে এই মহান গুণে গুণান্বিত হতে আহ্বান করে ও উৎসাহ দেয়, সমান আচরণ করতে বা মন্দের মোকাবেলা মন্দ দ্বারা করতে নিষেধ করে এবং উত্তম কথার দ্বারা জবাব দিতে, কষ্ট এড়িয়ে চলতে ও মন্দ ব্যবহার ক্ষমা করে দিতে উৎসাহ দেয়। তন্মধ্যে একটি হল আল্লাহর বাণী-

وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষকে ক্ষমাকারী। আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরকে ভালবাসেন।” (আলে ইমরান: ১৩৪)

কোন লোক নিজের মাঝে এই তিনটি ভিত্তির সমন্বয় ঘটালেই কেবল সহনশীল হতে পারবে; অন্যথায় নয়।

আরেক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সহনশীলতা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেনঃ

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ

“নিশ্চয়ই ইবরাহীম ছিল আল্লাহভিমুখী ও সহনশীল।”

আমরা সবাই জানি, হযরত ইবরাহীম (আ:) তার কওমের থেকে কতটা কষ্টের সম্মুখীন হয়েছেন। তারা তাকে আগুনে নিক্ষেপ করেছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর পুত্র ইসমাঈলকেও এই গুণের সাথে উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ

“অত:পর আমি তাকে একটি সহনশীল সন্তানের সুসংবাদ দিলাম।”

অনুরূপ আল্লাহর নবী হুদ আলাইহিস সালামের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন:

قَالَ يَاقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ

“সে বলল: হে আমার সম্প্রদায়! আমার মাঝে নির্বুদ্ধিতা নেই। বরং আমি সকল জগতের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একজন বার্তাবাহক।”

তিনি আ: সে সময় এ সবর করেছিলেন, যখন তার কওম তাকে গালি দিচ্ছিল, তার সাথে বিদ্রুপ করছিল। তিনি এসবের মোকাবেলা করেছেন তাওহীদের দাওয়াতের মাধ্যমে। তাদের নিকট তার মূখ্য বিষয়টি তথা তার রিসালাতটিই স্পষ্ট করেছেন এবং তাদের সুমতি হওয়ার আসায় উত্তমভাবে তাদেরকে উপদেশ দিয়েছেন।

সহনশীলতা ও গোস্বা না করার ব্যাপারে রাসুল ﷺ থেকে অনেক বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণিত রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হাদিসে রয়েছে: তিনি আব্দুল কায়েসের প্রতিনিধি দলের নেতার উদ্দেশ্য বলেন:

> “নিশ্চয়ই তোমার মধ্যে এমন দু'টি বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যেগুলোকে আল্লাহ ভালবাসেন: তা হল সহনশীলতা ও ধীরস্থিরতা। (বর্ণনা করেছেন ইমাম বুখারী রহ:)

আরেক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট উপদেশ চাইতে আসল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন:

> তুমি ক্রোধান্বিত হয়ো না। লোকটি একই আবেদন বার বার করল। রাসূল ﷺ ও প্রতিবার বললেন: তুমি ক্রোধান্বিত হয়ো না।

বর্ণনাকারী সাহাবী আবু হুরায়রা রা: বলেন:

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন একথা বলেছেন, তখন আমি চিন্তা করে দেখলাম, ক্রোধ সকল অনিষ্টকে একত্রিত করে। ক্রোধের সময় বিবেক হ্রাস পায়। ফলে তা অন্যায় কথা বলা ও সত্য গোপন করার দিকে নিয়ে যায়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর একটি দু'আ ছিল:

"(হে আল্লাহ!) আমি তোমার নিকট ক্রোধের সময় ও খোশ হালতে সঠিক কথা বলার তাওফীক প্রার্থনা করি।" (বর্ণনা করেছেন ইমাম নাসায়ী রহ:)

নবী ﷺ আরও বলেন:

কোন বিচারক যেন ক্রোধান্বিত অবস্থায় দুই ব্যক্তির মাঝে ফায়সালা না করে। (বর্ণনা করেছেন ইমাম বুখারী ও মুসলিম রহ:)

আবু হুরায়রা রা: থেকে বর্ণিত আছে,

জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট তার ঋণ চাইতে আসল। লোকটি কঠোরভাবে কথা বলল। তখন তাঁর সাহাবাগণ তার উপর আক্রমণ করতে উদ্যত হল।

রাসূল ﷺ বললেন:

তাকে ছাড়। কারণ পাওনাদারের বলার অধিকার আছে। তারপর বললেন, তাকে তার দাঁতের মত একটি দাঁত দাও।

সাহাবাগণ বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তো তার দাঁতের চেয়ে উত্তম দাঁত ছাড়া অন্য কিছু পাচ্ছি না। রাসূলুল্লাহ বললেন, তা ই দাও। কারণ তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম হল, সর্বোত্তম বিচারকারী।

(বর্ণনা করেছেন ইমাম মুসলিম রহ)

অন্য হাদীসে নবী ﷺ বলেন:

"বান্দা এমন কোন ঢোক গিলে না, যা আল্লাহর নিকট ক্রোধের ঢোক থেকে উত্তম, যা সে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সংবরণ করে"। (বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমাদ ও ইবনে মাযাহ।)

রাসূল ﷺ আরও বলেন:

আছাড় দেওয়ার দ্বারা বীর হয় না। বীর হল, ঐ ব্যক্তি, যে ক্রোধের সময় আত্মনিয়ন্ত্রণ করতে পারে। (বর্ণনা করেছেন ইমাম বুখারী ও মুসলিম রহ:)

সুতরাং সহনশীলতা হল, শক্তি ও দৃঢ়তার আলামত। আল্লাহ তা'আলা বলেন

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

"নিশ্চয়ই যে সবর করে ও ক্ষমা করে দেয়, (তার) এটা দু:সাহসিকাতর কাজ।" (শুরা: ৪৩)

সহনশীলতার শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে সাহাবাদের থেকে অনেক উক্তি বর্ণিত রয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি হল:

উমার রা: থেকে বর্ণিত আছে:

যেকোন কল্যাণকর কাজে চিন্তা-ভাবনা করতে হয়। তবে যেগুলো পরকালের বিষয় সেগুলো ব্যতীত। হযরত আলী রা: থেকে বর্ণিত আছে, তোমার সম্পদ ও সন্তান বেড়ে যাওয়া কল্যাণের বিষয় নয়; বরং কল্যাণের বিষয় হল তোমার ইলম বৃদ্ধি পাওয়া এবং সহনশীলতা ব্যাপক হওয়া।

আল্লাহর ইবাদত করে মানুষের সাথে বড়াই না করা। সৎকর্ম করলে আল্লাহর প্রশংসা কর আর গুনা করলে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। (আবু নুআইম হিলয়াতুল আওলিয়ায় উল্লেখ করেন।)

তিনি আরও বলেন:

যার কথা নম্র হয়, তার ভালবাসা অবধারিত হয়ে যায়। নির্বোধের উপর তোমার সহনশীলতা তার উপর তোমর সহযোগীর সংখ্যা বাড়িয়ে দেয়। মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রা: বলেন: বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত দেওয়ার স্তরে পৌঁছতে পারে না, যতক্ষণ না তার সহনশীলতা অজ্ঞতার উপর এবং স্থৈর্য প্রবৃত্তির উপর প্রাধান্য পায়। সে একমাত্র সহনশীলতার শক্তি দ্বারাই এ স্তরে পৌঁছতে পারে।

(বর্ণনা করেছেন আবুল কাসেম আততাবারী আররাযী রহ:)

মুআবিয়া রা: আরাবা ইবনে আউসকে বলেন:

হে আরাবা! তুমি কিসের দ্বারা তোমার কওমের সরদার হয়েছো?

আরাবা বলল,

হে আমীরুল মুমিনীন! আমি তাদের অজ্ঞদের প্রতি সহনশীল ছিলাম, তাদের আবেদনকারীকে দান করতাম এবং তাদের প্রয়োজন পূরণের চেষ্টা করতাম।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পরে উম্মাহর এ সকল নেতৃবন্দের জীবনেও এ গুণটি কত গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা এসকল বর্ণনাগুলোই স্পষ্ট করে। এই গুণই তাদেরকে উম্মাহর নেতা বানিয়েছে। আর তারা উম্মাহকেও এ ব্যাপারে সবচেয়ে উপদেশ দিতেন। যেমনটা পূর্বে বর্ণনা করেছি।

আর এই মহান গুণে গুণান্বিত হওয়ার ফলাফল কি?! আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন এরূপ ব্যক্তিকে ডেকে স্বাধীনতা দিবেন, আন্তনয়না হুরদের মধ্য হতে যত ইচ্ছা গ্রহণ করতে পার।

মুআয ইবনে আনাস রা: থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

যে ব্যক্তি ক্রোধ সংবরণ করে, অথচ সে তা বাস্তবায়ন করতে পারত, আল্লাহ তা'আলা তাকে কিয়ামতের দিন সকল সৃষ্টির সামনে ডাকবেন, অত:পর তাকে হুরদের থেকে যত ইচ্ছা নেওয়ার স্বাধীনতা দিবেন। (বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমাদ রহ:)

তৃতীয় গুণ: الحكمة (প্রজ্ঞা)

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

"তিনি যাকে চান প্রজ্ঞা দান করেন, আর যাকে প্রজ্ঞা দান করা হল, তার বিপুল পরিমাণে কল্যাণ লাভ হল। উপদেশ তো কেবল তারাই গ্রহণ করে, যারা বুদ্ধির অধিকারী।" (বাকারা:২৬৯)

الحكمة শব্দটি আভিধানিকভাবে حكم يحكم حكما وحكمة فهو حكيم থেকে উদগত। حكم الشخص অর্থ হল: লোকটি প্রজ্ঞাবান হল। অর্থাৎ লোকটির কাজ-কর্ম ও কথাবার্তা, চিন্তা-ভাবনা ও সঠিক বিবেচনার সাথে সম্পাদিত হয়। আরেকটি ব্যবহার- أبغض بغيضك بغضا رويدا....إذا أنت حاولت أن تحكما 'তুমি যদি 'হুকুম' (শাসন) করতে চাও, তবে যে তোমার সাথে শত্রুতা করে, তুমি তার সাথে রয়ে রয়ে শত্রুতা কর।' এখানে 'তুমি যদি হুকুম করতে চাও' মানে হচ্ছে, তুমি যদি হাকিম হতে চাও।

'হিকমাহ' এর পারিভাষিক অর্থ: কেউ কেউ বলেছেন: হিকমাহ হল, নবুওয়াত ছাড়া সঠিক কথা বলা।

কেউ বলেন: তা হচ্ছে যেটা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কথায় এসেছে: হে আল্লাহ! তাকে হিকমাহ শিক্ষা দাও। কেউ বলেন: তা হল দ্বীনের ইলম।

কেউ বলেন: তা হচ্ছে কুরআনের ইলম। কেউ বলেন: তা হচ্ছে দ্বীনের ফিকহ। কেউ বলেন: তা হচ্ছে: আল্লাহর ভয়। কেউ বলেন: তা হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলার আদেশ-নিষেধ বুঝা। আর এ সবগুলো অর্থই রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিম্নোক্ত বাণীতে প্রযোজ্য: الحكمة يمانية (হিকমাহ ইয়ামান থেকে আসে)

এমনিভাবে তার আরেকটি বাণী- علمه الحكمة (হে আল্লাহ! তাকে হিকমাহ শিক্ষা দাও।) বিশেষত: الفقه يمان 'ফিকহ ইয়ামানী' কথাটি।

এটি একটি আল্লাহর দান, তিনি তার বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। যেমনটা আল্লাহ পুর্বোক্ত পবিত্র আয়াতে বলেছেন।

তবে এটা আল্লাহ প্রদত্ত হওয়ার মানে এই নয় যে, তা অর্জনযোগ্য নয়। বরং মূল কথা হচ্ছে তার অনেকগুলো উপায় আছে, যেগুলো অর্জনের জন্য চেষ্টা করতে হবে। যেন আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়ায় তার কিছু অংশ লাভ করা যায়।

বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে এটা জানলে যে, এর কতগুলো ভিত্তি বা স্তম্ভ রয়েছে, যখন কোন ব্যক্তি সেগুলোর প্রতি যত্নশীল হবে, তখন উক্ত বৈশিষ্ট্যমন্ডিত ব্যক্তি হিকমাহ পাওয়ার জন্য অধিকতর উপযুক্ত হয়।

ইবনুল কায়্যিম রহ: এর বর্ণনায় উক্ত স্তম্ভগুলো হচ্ছে:

"ইলম, সহনশীলতা ও ধীরস্থিরতা।"

আর এর জন্য বিপদজনক হল, তার বিপরীত বিষয়গুলো। "অজ্ঞতা, অস্থিরতা ও তরিৎ প্রবণতা।"

সুতরাং অজ্ঞ, অস্থির ও তরিৎ প্রবণ ব্যক্তির কোন হিকমাহ নেই। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত। কোথাও এ তিনটি স্তম্ভের সাথে আরেকটি যুক্ত করা হয়: "সম্মানের স্থানে প্রকাশ লাভ করাকে অপছন্দ করা।"

কখনো অনেককে শয়তান এই প্রবঞ্চনা দেয় যে, সে এমন হিকমতের অধিকারী, যেমনটা অন্য কারো নেই এবং সে ই তার সঠিক বিবেচনা দ্বারা যেকোন সম্মানের স্থানে প্রকাশ লাভ করার উপযুক্ত। কখনো তার সামনে বিষয়টিকে এভাবে সুন্দর করে তোলা হয় যে, সে ই তো মুসলিম উম্মাহর হিতকামনা, স্বার্থচিন্তা করা ও এধরনের কল্যাণের পথে আছে। ফলে সে নিজ জ্ঞান দ্বারা প্রবঞ্চিত হয়। এর কারণে ব্যার্থতা ও বঞ্চনা আসে।

কারণ আমরা কুরআন-সুন্নাহ থেকে জেনেছি, আত্মপ্রবঞ্চিত ব্যক্তির আল্লাহর তাওফীক লাভ হয় না। আর যে ব্যাপকভাবে প্রকাশ লাভ করা ও দুনিয়াবী সম্মান লাভ করা থেকে বেঁচে থাকতে আগ্রহী থাকে, তার সাথে আল্লাহর তাওফীক যুক্ত হয়। যদি সঠিকভাবে ব্যক্ত করতে সক্ষম হয়ে থাকি, তবে বিষয়টি এমনই।

ইমাম শাফেয়ী রহ: যখন কোন মাসআলায় কারো সাথে বিতর্ক করতে বাধ্য হতেন, তখন তিনি কামনা করতেন, যাতে প্রতিপক্ষ আল্লাহর তাওফীক ও সাহায্য প্রাপ্ত হয় এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে তার কথা সঠিক করে দেওয়া হয়। (হুলয়াতুল আউলিয়া)

তিনি বলতেন,

> আমার সিদ্ধান্ত সঠিক, কিন্তু ভুলেরও সম্ভাবনা রাখে, আর অন্যদের সিদ্ধান্ত ভুল, কিন্তু সঠিক হওয়ারও সম্ভাবনা রাখে।

আর এটা শুধু এই প্রয়োজনেই বলতেন, যা এখন স্পষ্ট করলাম। তবে আমার কথার এটা উদ্দেশ্য নয় যে, একজন লোক তার মত গোপন করবে। বিশেষত: যদি সে এমন নেতা হয়, যার বুদ্ধি-বিবেচনার কথা সকলের জানাশোনা। বরং তার জন্য, তিনি যে সিদ্ধান্তকে সঠিক মনে করেন না, সেটার অনুসরণ করা দুষণীয়।

তাই মূল বিষয় হচ্ছে, প্রকাশ লাভ করাকে অপছন্দ করা এবং নিজের হিকমাতের দ্বারা তুষ্ট না হওয়া। অন্যথায় হিকমতের গুণে গুণান্বিত হওয়া ও সে দাবি মতে কাজ করার জন্য তিনিই অধিক উপযুক্ত। যেহেতু তার জন্য হিকমাহ অনেক বেশি প্রয়োজন। এজন্যই তার জন্য তা অর্জনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা অবশ্য কর্তব্য। যেন যে স্থানে হিকমাহ সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সেখানে তার উপর আল্লাহর তাওফীক ও সংশোধন অবতীর্ণ হয়।

যেমনটা ইবনুল কায়্যিম রহ: হিকমাহ এর সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেন:

> "হিকমাহ হচ্ছে: যা যেভাবে করা উচিত, তা সেভাবে সঠিক সময়ে করা। তার উপর এটাও কর্তব্য যে, তিনি প্রতিটি জিনিসকে তার সঠিক মাপে পরিমাপ করার জন্য নিজেকে প্রশিক্ষিত করে তোলবেন, দূরদৃষ্টি ও উদার হৃদয়ের অধিকারী হবেন।"

আর সবগুলোই নিজ উম্মাহ ও মামুরদের কল্যাণে নিয়োজিত করবেন। তাদের শান্তির জন্য নিজের জীবন ও সময় ব্যয় করবেন। তার একমাত্র চিন্তাই থাকবে উম্মাহ। ফলে এর বিনিময়ে আল্লাহ তাকে উক্ত হিকমাহ দান করবেন।

বর্ণিত আছে, আল্লাহর নবী হযরত ঈসা আ: বলেছেন: "হিকমাহ হচ্ছে প্রত্যেকের অন্তরের নূর।"

হ্যাঁ, এটি একটি নূর, এর মাধ্যমে আল্লাহ তার একনিষ্ঠ বান্দাদের অন্তরকে আলোকিত করেন। যাদেরকে তিনি নির্বাচিত করেন এবং সরল পথের দিকনির্দেশনা দেন। সেই সরল পথ, যা এমন জান্নাতে নিয়ে যায়, যার ব্যাপ্তি আসমান ও যমীন। যা মুত্তাকীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।

হিকমাহর মহত্ব ও গুরুত্বের কারণে আল্লাহ তার কিতাবে হিকমাহর কথা ২০ বার উল্লেখ করেছেন। হিকমাহর মাধ্যমে নেতা তার জনগণকে অজ্ঞতা ও বর্বতার অন্ধকার থেকে ভালবাসা, সভ্যতা ও ইলমের নূরের দিকে নিয়ে আসেন।

আর তিনি কুরআন-সুন্নাহকে স্বীয় দাওয়াতের নীতিনির্ধারক বানান। যেমনটা আল্লাহ তার নিম্নোক্ত আয়াতে বলেছেন:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

"তুমি নিজ প্রতিপালকের পথে মানুষকে ডাকবে হিকমত ও সদুপদেশের মাধ্যমে আর (যদি কখনও বিতর্কের দরকার পড়ে, তবে) তাদের সাথে বিতর্ক করবে উৎকৃষ্ট পন্থায়। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক যারা তার পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে, তাদের সম্পর্কে ভালভাবেই জানেন এবং তিনি তাদের সম্পর্কেও পরিপূর্ণ জ্ঞাত, যারা সৎপথে প্রতিষ্ঠিত।" (নাহল:১২৫)

এখন আমি মুনাফিক সরদার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সলূলকে হত্যা না করার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যে হিকমাহ ছিল, তা নিয়ে আলোচনা করবো।

বিভিন্ন ঘটনায় সে রাসূলুল্লাহ ﷺ কে কত কষ্ট দিয়েছে! যা স্ব স্ব স্থানে জ্ঞাতব্য। তার মধ্যে একটি ঘটনা হল, যা ইমাম বুখারী রহ: জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রা: থেকে বর্ণনা করেছেন: তিনি বলেন:

> আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সঙ্গে যুদ্ধ করলাম। তার সঙ্গে কিছু মুহাজিরও আসলো এবং তাদের সংখ্যা বেশি হয়ে গেল। মুহাজিরদের সাথে হাসি তামাশাকারী এক ব্যক্তি ছিল। সে জনৈক আনসারীকে আঘাত করল। ফলে আনসারীটি ভীষণ রেগে গেল। অবশেষে উভয়েই নিজেদের লোকদেরকে ডাকতে লাগল। আনসারী ডাক দিল, হে আনসারগণ! মুহাজির ডাক দিল, হে মুহাজিরগণ! নবী ﷺ বের হয়ে দেখে বললেন: ব্যাপার কি, জাহিলিয়্যাতের ডাক শুনতে পাচ্ছি? অত:পর বললেন, তাদের কি হয়েছে? তখন তাকে মুহাজির কতৃক আনসারীকে আঘাত করার কথা জানানো হল।
>
> বর্ণনাকারী বলেন: তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: তোমরা এগুলো (সাম্প্রদায়িক ডাক) পরিহার কর, কারণ এগুলো নিকৃষ্ট বিষয়। আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সলূল বলল: তারা কি আমাদের বিরুদ্ধে পরস্পরকে ডেকেছে? আমরা মদীনায় ফিরে গেলে, অচিরেই সেখানকার সম্মানিতরা নীচুদেরকে বের করে দিবে।
>
> (বর্ণনা করেছেন ইমাম বুখারী রহ:)

এই অভিশপ্তের এর দ্বারা উদ্দেশ্য ছিল মুহাজির ও তাদের ভাই আনসারদের মাঝে বিদ্বেষ সৃষ্টি করা এবং তাদের মাঝে ফেৎনা ও বিভেদ ছড়িয়ে দেওয়া।

অত:পর যখন রাসূল ﷺ এর নিকট তার এ কথা পৌঁছলো, তখন উমার রা: তার নিকট ছিলেন। উমার রা: বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! এই খবীসকে কি হত্যা করে ফেলবো না?

নবী ﷺ বললেন, পাছে লোকে একথা বলে যে, সে তার সাথীদেরকে হত্যা করত। বর্ণনা করেছেন ইমাম বুখারী রহঃ। আরেক বর্ণনায় আছে, তখন রাসূল ﷺ বললেনঃ তখন কি হবে উমার, যখন লোকে বলবে, মুহাম্মাদ তার সাথীদেরকে হত্যা করে? তাই এটা করো না; বরং যাত্রার ঘোষণা দাও। (সীরাতে ইবনে হিশাম)

রাসূল ﷺ শুধু তাকে হত্যা ত্যাগ করেই ক্ষান্ত হননি। বরং তার প্রতি কোমল আচরণও করেছেন এবং তাকে উত্তম সাহচর্য দান করেছেন।

বিষয়টি স্পষ্ট হয় এই ঘটনা দ্বারা, যখন আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের পুত্র আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট তার পিতাকে হত্যা করার অনুমতি চাইলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ বরং সে যতদিন আমাদের মাঝে থাকে, তত দিন আমরা তার সাথে কোমল আচরণ করবো এবং উত্তম সাহচর্য দান করবো। (সীরাতে ইবনে হিশাম)

এখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে হত্যা করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকটি স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তা হচ্ছে, ইবনে উবাইয়ের ব্যাপারে যাদের জানা নেই, তাদের এই ধারণা হতে পারে যে, মুহাম্মদ তার সাথীদেরকে হত্যা করে। আর এটা তাদেরকে ইসলাম থেকে আরও দূরে সরিয়ে দিবে।

আর তার পক্ষ থেকে উমার রাঃকে অসময়ে যাত্রার ঘোষণা দেওয়ার আদেশ, অতঃপর ক্লান্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত ক্রমাগত সফর করার উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদেরকে কাজে ব্যস্ত করে ফেৎনা থেকে ফিরানো। যে ফেৎনা ইবনে উবাই মুহাজির ও আনসারদের মাঝে ছড়িয়েছিল। আর এর উদ্দেশ্য ছিল মুহাজির ও আনসারদের মাঝে ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ব নষ্ট করা। আর রাসূল ﷺ এর উক্ত হিকমাহ পরে ফল দিয়েছিল।

ফলে একসময় মুনাফিকদের ব্যাপারটিই শেষ হয়ে যায়। ইবনে উবাইয়ের বিষয়ও সকলের সামনে প্রকাশ হয়ে যায়। এমনকি এরপর যখনই সে কোন নতুন কিছু ঘটাত, তখন তার কওমই তাকে ভর্ৎসনা করত, জবাবদিহি করত ও শাসাত। যখন তাদেও এ অবস্থা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট পৌঁছলো, তখন রাসূল ﷺ উমার রাঃ কে বলেনঃ হে উমার! কেমন দেখছো?

আল্লাহর শপথ! যে সময় তুমি তাকে হত্যা করতে বলেছো, তখন যদি আমি তাকে হত্যা করতাম, তাহলে তার জন্য অনেকেরই মন কেঁদে উঠত।

কিন্তু এখন যদি ঐ সকল লোককেই তাকে হত্যা করতে আদেশ করি, তাহলে তারাই তাকে হত্যা করতে রাজি হবে। উমার রাঃ বলেনঃ আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাজই আমার কাজ অপেক্ষা অধিক বরকতপূর্ণ। (সীরাতে ইবনে হিশাম)

আরেকটি ঘটনায় হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাঃ বর্ণনা করেনঃ তিনি বলেনঃ

> রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন জিইররানায় বনু হাওয়াযিনের গনিমত বন্টন করলেন, তখন বনু তামিমের এক ব্যক্তি বলল, হে মুহাম্মদ ইনসাফ কর! রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ হে হতভাগা! আমি যদি ইনসাফ না করি, তাহলে কে ইনসাফ করবে? আমি যদি ইনসাফ না করি, তাহলে তো আমি ব্যার্থ ও ধ্বংস! তখন উমার রাঃ বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি উঠে এই মুনাফিককে হত্যা করে ফেলবো না?
>
> রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহর পানাহ! অন্যান্য জাতি শুনতে পাবে যে, মুহাম্মাদ তার সাথীদেরকে হত্যা করে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ এই ব্যক্তি ও তার কতিপয় সাথী এমন যে, তারা কুরআন পাঠ করে, কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করে না। (বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমাদ রহঃ)

মোট কথা মুনাফিককে হত্যা করা বা তার উপর হদ প্রয়োগ করা কয়েকটি কারণে নিষিদ্ধ, যা ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহঃ সংক্ষেপে বলেছেন এভাবেঃ

১. তার হদ বা হত্যার বিষয়টি এমন শরয়ী প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত না হওয়া, যা বিশেষ-সাধারণ সবাই বোঝে।
২. বা তার উপর তা কায়েম করতে গেলে সাধারণ লোকজন ইসলামে প্রবেশ করার ব্যাপারে অনাগ্রহী হয়ে উঠবে বা অনেকে মুরতাদ হয়ে যাবে বা কোন কওম এমন যুদ্ধ বা ফেৎনা সৃষ্টি করবে, যা মুনাফিককে হত্যা না করার ফাসাদ থেকে আরও বেশি। যার ফলে তার উপর হদ কায়েম করা সম্ভব হয় না।

অতঃপর শায়খ ইবনে তাইমিয়া বলেনঃ

উপরোক্ত দু'টি কারণ এখনও ধর্তব্য। তবে একটি কারণ এখন নেই, তা হচ্ছে: কখনো এই আশঙ্কা করা হয় যে, মানুষ ধারণা করবে, সে তার সাথীদেরকে অপরাপর রাজা-বাদশাদের মত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে হত্যা করে। এটা বর্তমানে নেই। তবে বর্তমান কালের অনেক অজ্ঞরা যা করে, তা নয়.. .. .. লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাহ বিল্লাহ..

তারা এমন এমন অজুহাতে সাধারণ মুসলিমদেরকে মুনাফিক ও কাফের সাব্যস্ত করে, যার ব্যাপারে আল্লাহ কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। ফলে মানুষকে বীতশ্রদ্ধ করে তোলে। এমনকি মুসলিমদেরকেও দ্বীন ও শরীয়তের ব্যাপারে অনাগ্রহী করে তোলে ।

তারা কি তাদের নবীর অনুসরণ করতে পারে না?! ইবনে উবাইকে হত্যা না করার ক্ষেত্রে তিনি যে হিকমত অবলম্বন করেছিলেন তারা কি তা চিন্তা করে না? অথচ তার কপটতা সাধারণ মুসলিমদের মাঝে প্রচারিত হয়ে গিয়েছিল!

তারা কি জানে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সাধারণ অমুসলিমরা-বিশেষত: যারা দারুল ইসলামের বাইরে, তারা-নেফাক ও মুনাফিক সম্পর্কে কিছু না জানবে এবং যেকোন ইসলামের নামধারীকেই প্রকৃত মুসলিম বলে মনে করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত মুনাফিককেও হত্যা করা উচিত নয়,

যদিও তার নেফাকী মুসলমানদের জানা শোনা থাকে, যতক্ষণ না উক্ত নেফাকী সকল মানুষের সামনে প্রকাশ্য ও স্পষ্ট হয়ে উঠে।

অতএব যদি এমন ব্যক্তি স্বীয় সম্প্রদায়ের প্রতিরক্ষায় থাকে, আর তার নেফাকী তাদের মাঝে বা অন্যান্য মুসলিমদের মাঝে পরিচিত নয়, তাহলে তার ব্যাপারে সবর করা হবে, যতক্ষণ না তার বিষয়টি তার নিজের থেকেই প্রকাশিত হয়ে পড়ে অথবা তার সম্প্রদায়ের মাঝে ও সকল মানুষের মাঝে তার নেফাকী প্রসিদ্ধি লাভ করে।

আর তখনই কেবল নব্য ধর্মের ব্যাপারে ঐ সকল সংশয়গুলো সৃষ্টি হবে না, যা সাধারণত: মানুষের মনে এসে থাকে এবং অন্তর ও বিবেক তাতে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। বিষয়টি সহজ নয়, কারণ রাসূল ﷺ মুনাফিকদের থেকে অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন। তাদের সাথে হিকমতের সাথে কাজ করেছেন, যেমনটা বর্ণনা করেছি।

এর মাধ্যমে রাসূল ﷺ অধিকাংশ শত্রুকে এবং কাফেরদের লিডারদেরকে এমন সুযোগ দিয়েছেন যে, তারা ঈমানদারদের লিডারে পরিণত হয়েছে। কিন্তু তুমি যাদেরকে আহ্বান করছো, তারা তো প্রাণহীন। কারণ এরা তো মুনাফিকদেরকেও নয়; মুসলিমদেরকে হত্যা করছে! লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ!! তবে যাদের ব্যাপারে আল্লাহ ভিন্নটা চেয়েছেন তারা ব্যতীত।

মুসলমানদেরকে উন্নত চরিত্রের দিকে আহ্বান করার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ এর একটি হিকমতি পন্থা ছিল, যা ইমাম আহমাদ রহ: তার মুসনাদে আবু উমামা থেকে বর্ণনা করেছেন:

> এক যুবক রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট আসার পর বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে যিনার অনুমতি দিন! তখন সবাই তার দিকে তাকালো। তাকে ধমকালো। তারা বলল, আশ্চর্য! আশ্চর্য!
>
> রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: কাছে এসো। লোকটি কাছে এসে বসল। তারপর তিনি তাকে বললেন, তুমি কি তোমার মায়ের ব্যাপারে এটা পছন্দ কর? সে বলল: আল্লাহর শপথ! না, আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গিত করুন! সে আরো বলল: কোন মানুষই তো তার মায়ের ব্যাপারে এটা পছন্দ করে না। রাসূল ﷺ বললেন: তাহলে তুমি কি তোমার মেয়ের জন্য এটা পছন্দ কর? সে বলল, আল্লাহর শপথ! না, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গিত করুন!
>
> সে আরো বলল, কোন মানুষই তো তার মেয়ের জন্য এমনটা পছন্দ করে না। রাসূল ﷺ বললেন: তাহলে তুমি কি তোমার বোনের জন্য এটা পছন্দ কর? সে বলল: না হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহর শপথ! আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গিত করুন! সে আরও বলল, কোন মানুষই তো তার বোনের জন্য এটা পছন্দ করে না। রাসূল ﷺ বললেন: তাহলে কি তুমি তোমার ফুফুর জন্য এটা পছন্দ কর? সে বলল, আল্লাহর শপথ! না, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গিত করুন! তিনি বললেন, তাহলে কি তুমি তোমার খালার জন্য এটা পছন্দ কর? সে বলল: না, আল্লাহর শপথ! হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গিত করুন! সে আরও বলল, কোন মানুষই তো তার খালার জন্য এটা পছন্দ করে না।

বর্ণনাকারী সাহাবী বলেন: অত:পর রাসূল ﷺ তার উপর তার হাত রেখে বলেন: হে আল্লাহ! তার গুণা ক্ষমা কর! তার অন্তর পবিত্র করে দাও! তার লজ্জাস্থান হেফাজত কর! তারপর থেকে এ যুবক আর কোন দিকে তাকাতো না। (বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমাদ ও তাবরানী)

আরেকটি হাদিসে, ইমাম মুসলিম মুআবিয়া ইবনে হাকাম আস-সুলামী থেকে বর্ণনা করেন,

আমি রাসূল ﷺ এর সাথে নামায পড়ছিলাম। ইত্যবসরে লোকদের মধ্যে এক ব্যক্তি হাচি দিল। আমি তার উত্তরে বললাম: ইয়ারহামুকাল্লাহ! তখন লোকজন আমার প্রতি তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। আমি বললাম: ধ্বংস তাদের! তোমাদের কি হয়েছে, আমার দিকে দেখছো! তখন তারা তাদের হাত রানে মারতে লাগল।

আমি যখন দেখলাম, তারা আমাকে চুপ করতে বলছে, তখন আমি চুপ করলাম। অত:পর যখন রাসূল ﷺ নামায শেষ করলেন: আমার পিতা মাতা তার জন্য উৎসর্গিত! আমি তার পূর্বে বা পরে তার থেকে উত্তম শিক্ষক কখনো দেখিনি। তিনি আমাকে ধমকিও দিলেন না, মারলেনও না, ভর্ৎসনাও করলেন।

তিনি বললেন: এ হল নামায, এর মধ্যে মানুষের কথার মত কথাবার্তা বলা যায় না। এতে শুধু তাসবীহ, তাকবীর ও কুরআন পাঠ করতে হয়।

তার হিকমতের আরেকটি চিত্র হল, হুদায়িবিয়ার সন্ধির সময়ের ঘটনা। দাওয়াতের নতুন একটি পর্যায়ের ভিত্তি স্থাপন করতে, দলে দলে মানুষের ইসলামে প্রবেশ করার ক্ষেত্রে, বহু দেশ বিজয় করতে এবং আল্লাহর বান্দাদেরকে বান্দাদের রবের ইবাদতে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে এর যে বিরাট ফলাফল ছিল তাও এর অন্তর্ভূক্ত।

আমাদের নেতারা কখন তাদের নবী ﷺ এর হিকমত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে? তারা কখন তার আদর্শের উপর চলবে?

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা বলেন:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

"বস্তুত রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ এমন ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহ ও আখেরাত দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে।" (আহযাব:২১)

আল্লাহর শপথ! আমি সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনবোধ করছি এমন একজন নেতার, যার চিন্তা-চেতনায় মৌলিকভাবে এ গুণগুলো বিদ্যমান থাকবে। আমাদের কত বড় হঠকারিতা ও দু:সাহসিকতা যে, আমরা এমন কাজে লিপ্ত হই, যা আল্লাহর দ্বীনকে কলঙ্কিত করে!

আমি জানি, তাদের মধ্যে অনেক এমন মুসলিম আছে, যারা নম্র অবস্থানকে দুর্বলতা ও শৈথিল্য মনে করে। অনেক সময় একনিষ্ঠ ও দ্বীনের ব্যাপারে আত্মমর্যাদাশীল লোকেরাই এমন হয়, যেমন ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাহাবাগণ।

ইমাম বুখারী রহ: বর্ণনা করেন,

নবী ﷺ যখন হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় আলী রা: কে দিয়ে লিখাচ্ছিলেন এবং তাকে বললেন, লিখ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, তখন সুহাইল বলল, রহমান কে! তাকে তো আমরা চিনি না।

বরং এভাবে লিখ: বিসমিকা আল্লাহুম্মা। তখন মুসলিমরা বলল, আল্লাহর শপথ! আমরা কিছুতেই বিসমিল্লাহ ছাড়া লিখবো না। তখন নবী ﷺ বললেন: লিখ, বিসমিকা আল্লাহুম্মা।

অত:পর নবীজী ﷺ বললেন: লিখ, "নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর উপর মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সন্ধি করছে"। তখন সুহাইল বলল: আল্লাহর শপথ! আমরা যদি বিশ্বাস করতাম, তুমি আল্লাহর রাসূল, তাহলে তো আমরা তোমাকে বায়তুল্লাহ হতে বঁধাই দিতাম না, তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধই করতাম না।

তাই লিখ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ। নবী ﷺ বললেন, 'আল্লাহর শপথ! আমি আল্লাহর রাসূল, যদিও তোমরা আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন কর। লিখ: মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ'।

কিন্তু এই হিকমতই আল্লাহর বিজয়কে তরান্বিত করেছে। আজকে আমাদের কত প্রয়োজন এমন একজন নেতার, যিনি এক্ষেত্রে নবী ﷺ এর আদর্শের অনুসরণ করবেন। তার থাকবে বিচক্ষণতা ও দূরদৃষ্টি এবং সে তরিৎপ্রবণ হবে না। কারণ যে সময় আসার পূর্বেই কোন জিনিস লাভ করতে চায়, তাকে বঞ্চিত করার মাধ্যমে শাস্তি প্রদান করা হয়।

নিশ্চয়ই মুসলিমদের নেতৃত্ব দেওয়া কোন সহজ বিষয় নয়। এটা কোন সম্মান বা সম্পদের দ্বারা সম্ভব হয় না। বরং এমন প্রজ্ঞাবান লোকদের দ্বারা হয়, যারা নিজেদের কথা ও কাজের পরিণতি বুঝেন। তারা জানবেন, কখন সঠিক সময়ে, সঠিক পদ্ধতিতে একটি সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

যেমন আবু বকর রা: এর হিকমাত ফুটে উঠেছিল, যখন রাসূল ﷺ ইন্তেকাল করলেন।

ইবনে আব্বাস রা: থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

> আবু বকর রা: বের হলেন, তখন উমার রা: লোকদের উদ্দেশ্যে কথা বলছিলেন। আবু বকর রা: বললেন: বসুন, তিনি বসলেন না। তখন আবু বকর রা: শাহাদাত পাঠ করলেন। ফলে সমস্ত মানুষ তার দিকে ঝুকে পড়লো। আর উমারকে পরিত্যাগ করল। তারপর তিনি বললেন: আম্মা বাদ, তোমাদের মধ্যে যে মুহাম্মাদের ইবাদত করত, তার মুহাম্মাদ তো মারা গেছে। আর যে আল্লাহর ইবাদত করত, তার আল্লাহ চিরঞ্জীব, তিনি কখনো মরেন না। আল্লাহ তা'আলা বলেন:
>
> وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ
>
> *"আর মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একজন রাসূল বৈ তো নন! তাঁর পূর্বে বহু রাসূল গত হয়েছে। তাঁর যদি মৃত্যু হয়ে যায় কিংবা তাকে হত্যা করে ফেলা হয়, তবে কি তোমরা উল্টো দিকে ফিরে যাবে? যে -কেউ উল্টো দিকে ফিরে যাবে, সে কখনই আল্লাহর কিছুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। আর যারা কৃতজ্ঞ বান্দা, আল্লাহ তাদেরকে পুরস্কার দান করবেন।" (আলে ইমরান:১৪৪)*
>
> আল্লাহর শপথ! তাদের অবস্থা এমন হল, যেন আবু বকরের তিলাওয়াতের পূর্বে তারা জানতই না যে, আল্লাহ তা'আলা এই নাযিল করেছিলেন। তখন সমস্ত মানুষ তার থেকে এটা লুফে নিল এবং প্রত্যেককেই এটা তিলাওয়াত করতে শোনা গেল।

নিশ্চয়ই এই কঠিন পরিস্থিতি, যা ইসলামী রাষ্ট্রের ভীত কাপিয়ে তুলেছিল এবং আদম আ: এর সৃষ্টি থেকে কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের উপর আপতিত বিপদসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় বিপদ ছিল, এ সময় মুসলমানদের হাল ধরার এবং তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য আবু বকর রা: এর অবলম্বনকৃত হিকমাহই ছিল সর্বাধিক কার্যকরী।

ইসলামী রাষ্ট্রকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে এবং ইসলাম বর্তমান যামানায় আমাদের পর্যন্ত পৌঁছার ক্ষেত্রে এর ভূমিকা ছিল অপরিসীম।

প্রজ্ঞাবান নেতা সে ই, যে মূখ্য সময়ে উম্মাহর জন্য বের হয়ে তার প্রজ্ঞাময় নেতৃত্ব প্রকাশ করে। যে নেতৃত্ব সাহায্য করবে সমাজের সমস্যাবলী সমাধানে, সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করণে, সকলকে এক সূতোয় আবদ্ধ করণে এবং সেই শত্রুদের মোকাবেলায় মুসলিমদের কাতারসমূহ সুদৃঢ় করণে, যারা সর্বদা মুসিলমদেরকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য, এবং মুসলিমদের থেকে ও মুসলিমদের একমাত্র রক্ষাকবচ দ্বীনে ইসলাম থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায় থাকে।

নবী ﷺ এর প্রজ্ঞাময় অবস্থান ও আদর্শ রাজনীতির উদাহরণ হচ্ছে, তিনি মুনাফিক সরদার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের কষ্ট সহ্য করেছেন, তবু তাকে হত্যা করেননি।

হযরত উমার রা: এর হিকমতের নমুনা হচ্ছে, তিনি তার পরিবারবর্গের ব্যাপারে কঠিন ছিলেন। একারণে যখন তিনি মুসলমানদেরকে কোন কল্যাণ, সফলতা ও সংশোধনের বিষয়ে আদেশ বা নিষেধ করতে চাইতেন, তখন তিনি সর্বপ্রথম তার পরিবারবর্গের মাধ্যমে তা আরম্ব করতেন, তাদেরকে প্রথমে উপদেশ দিতেন এবং বিপরীত করলে প্রথমে তাদেরকে শাস্তির ধমকি শুনাতেন।

যেমন- সালিম ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রা: থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

উমার রা: যখন মিম্বারে উঠতেন এবং মুসলমানদেরকে কোন বিষয়ে নিষেধ করতেন, তখন তিনি তার পরিবারবর্গকে জমা করে বলতেন, আমি মানুষকে এই এই বিষয় থেকে নিষেধ করেছি, আর মানুষ তোমাদের দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছে, যেমন পাখি গোশতের দিকে তাকিয়ে থাকে। আল্লাহর শপথ! আমি যদি তোমদের কাউকে এটা করতে দেখি, তাহলে দ্বিগুণ শাস্তি দিব।

এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় হিকমতপূর্ণ অবস্থান। কেননা মানুষ নেতা ও শাসকদের প্রতি লক্ষ্য করে। তাদের নীতি, প্রজাদের পূর্বে নিজ পরিবারের ক্ষেত্রে তাদের অবস্থান এবং তারা যার প্রতি আহ্বান করে, তার কার্যগত ও মৌখিক বাস্তবায়নের প্রতি লক্ষ্য করে। অনুরূপ স্বীয় পরিবার ও অধীনস্তদের ক্ষেত্রে তার বাস্তবায়ন দেখে।

চতুর্থ গুণ: الجود (দানশীলতা)

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى

"এবং তা থেকে দূরে রাখা হবে পরম মুত্তাকীকে, যে আত্মশুদ্ধি অর্জনের জন্য নিজ সম্পদ (আল্লাহর পথে) দান করে। অথচ তার উপর কারও অনুগ্রহ ছিল না, যার প্রতিদান দিতে হত, বরং সে (দান করে) কেবল তার মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টির প্রত্যাশায়।" (আলা: ১৭,১৮,১৯)

الجود (আলজূদু) অভিধানিকভাবে جاد থেকে উদগত। যেমন বলা হয়: جادت السماء غذاء (আসমান খাদ্য দান করেছে।) অর্থাৎ আসমান প্রবল বৃষ্টি বর্ষণ করেছে। অনুরূপ বলা হয়ে থাকে-لجواد। الفرس (অধিক দানশীল ঘোড়া) অর্থাৎ "দ্রুতগামী ঘোড়া"। আল্লাহ তা'আলা যাওয়াদ। যেহেতু যেখানে আল্লাহ তা'আলার হিকমত অনূকুল হয়, সেখানে তিনি অনেক বেশি দান করেন।

এর পারিভাষিক অর্থ হল, চাওয়া ছাড়াই অনেক বেশি দান করা, অথবা যে সম্পদ ব্যয় করা উচিত তা কোন বিনিময় ছাড়া ব্যয় করা।

দানশীলতা ঐ সকল কামেল লোকদের বৈশিষ্ট্য, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা কোন একটি উদ্দেশের জন্য নির্বাচিত করেছেন। তাই তাদের নিকট খরচ করাকে প্রিয় বানিয়ে দেন এবং তাদেরকে তাদের আন্তরিকভাবে দানবীর বানিয়ে দেন। এসকল লোক তাদের এ কাজের মাধ্যমে তাদের আশে পাশের লোকদের অন্তরের মালিক হয়ে যায়।

অন্তরের স্বভাবই তো এটা যে, যে তার প্রতি অনুগ্রহ করে, তাকে সে ভালবাসে। এজন্য নেতাই এই মহান গুণে গুণান্বিত হওয়ার সর্বাধিক উপযুক্ত। বিশেষত: যে যামানায় লোভ ও প্রতারণা ব্যাপক হয়ে গেছে।

উম্মাহর নেতৃত্ব অনেক দায়িত্বশীলতা দাবি করে। তাই এটি একটি চাপ। একটি ভার ও বোঝা; গৌরব নয়। এটি ব্যয় করা ও দান করার নাম, গ্রহণ করার নাম নয়।

তাই একজন নেতাকে এগুলো লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রজাদের প্রয়োজন পুরা করতে হবে। নিজ প্রয়োজনের উপর তাদের প্রয়োজনকে প্রাধান্য দিতে হবে। ইলমী, সামাজিক, দাওয়াতি, অর্থনৈতিক, সামরিক, তথা প্রচলিত সকল খ্যাতসমূহে সামর্থ্য অনুযায়ী দান করতে হবে।

তার দৃষ্টির সামনে থাকতে হবে রাসূল ﷺ এর এই হাদিস-

"তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেকেই স্বীয় দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।"

তাকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে ইলমী খাতের প্রতি। ইলমে নিয়োজিতদের জন্য দান করবে। বিভিন্ন ইলমী ও গবেষণা কেন্দ্র খুলবে। যেন আলিম ও তালিবুল ইলমের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

কারণ আমাদের যামানায় যে সমস্ত বেতনভোগী প্রশাসন আরব দেশগুলো ও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলো শাসন করছে, তারা ইলম ও আহলে ইলমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে, আলেমগণকে কারাগারে ঢুকাচ্ছে।

একারণে আলেমগণ সেখান থেকে পশ্চিমা কাফেরদের দেশে হিজরত করতে বাধ্য হন, যেন তাদের ইলমী অভিজ্ঞতার সংস্পর্শ পান এবং তাদের ঐ সমস্ত আবিস্কৃত বস্তুসমূহকে সরাসরি ব্যবহার করেন, যা সবচেয়ে প্রয়োজন আমাদের।

নবী ﷺ নবুওয়াতের পূর্বেও সর্বাধিক দানশীল ছিলেন। যেমন, ওহী নাযিলের সময় তার গুণাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে খাদিজা রা: বলেন: আপনি আত্মীয়তা সম্পর্ক রক্ষা করেন, বোঝা বহন করে দেন, হারানো জিনিসকে খুজে বের করে দেন, মেহমানদের মেহমানদারী করেন, হক বিপদে সাহায্য করেন। (বর্ণনা করেছেন ইমাম বুখারী রহ:)

আর নবুওয়াত লাভের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দানশীলতার বর্ণনা দিতে তো আমাদের ভাষাও ব্যার্থ হবে। তিনিই হলেন আখেরী নবী। ইবনে আব্বাস রা: বলেন:

> নবী ﷺ ছিলেন মানুষের মধ্যে সর্বাধিক দানশীল।

আর তিনি আরও অধিক দানশীল হয়ে যেতেন রমযান মাসে, যখন জিবরাঈল আ: তাকে সাক্ষাৎ দিতেন। জিবরাঈল আ: রমজানের প্রতি রাতে তার সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং তার সাথে কুরআন দাওর করতেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মুক্ত বাতাসের থেকেও বেশি পরিমাণে দান করতেন। (বর্ণনা করেছেন ইমাম বুখারী রহ:)

রাসূলুল্লাহ ﷺ কারো প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করতেন না।

যেমন সাহল ইবনে সা'দ রা: বলেন:

> জনৈকা মহিলা একটি চাদর নিয়ে নবী ﷺ এর নিকট আসল। সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি এই কাপড়টি আপনাকে দিচ্ছি।
>
> রাসূল ﷺ তা গ্রহণ করলেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ এর তা প্রয়োজনও ছিল।
>
> অত:পর তিনি কাপড়টি পরিধান করলেন। তখন জনৈক সাহাবী তা দেখতে পেয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! কত সুন্দর এটি! এটা আমাকে পরতে দিন!
>
> রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: হ্যাঁ।
>
> অত:পর যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ উঠে গেলেন, তখন সাহাবীগণ তাকে ভর্ৎসনা করল। তারা বলল, তুমি এটা ভাল করনি, তুমি দেখলে, রাসূল ﷺ নিজ প্রয়োজনে এটা গ্রহণ করেছেন, তারপরও তুমি তার কাছে তা চাইলে। অথচ তুমি জান, রাসূলুল্লাহর নিকট কোন কিছু চাইলে, তিনি নিষেধ করেন না।
>
> উক্ত সাহাবী বললেন, আমি যখন দেখলাম রাসূলুল্লাহ ﷺ এটা পড়েছেন, তখন আমি এর বরকত লাভের আশা করলাম, যাতে আমাকে এটার মধ্যে দাফন করা হয়। (বর্ণনা করেছেন ইমাম বুখারী রহ:)

আনাস রা: থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

> রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট ইসলামের ভিত্তিতে কোন কিছু চাওয়া হলে তিনি অবশ্যই তা দিতেন। তিনি বলেন: অত:পর তার নিকট এক ব্যক্তি আসল। তিনি তাকে দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী জায়গা ভর্তি বকরী দিলেন। লোকটি নিজ কওমে ফিরে গিয়ে বলল, হে আমার কওম! তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর, কারণ মুহাম্মাদ এত বেশি দান করে, যে দারিদ্র্যের ভয় করে না। (বর্ণনা করেছেন ইমাম মুসলিম রহ:)

রাসূলুল্লাহ ﷺ চাওয়ার পূর্বেই দান করতেন এবং তিনি এটাকে অনেক বড় সৌভাগ্য মনে করতেন।

রাসূল ﷺ বলতেন:

> আমার নিকট এটা আনন্দের বিষয় নয় যে, আমার নিকট ওহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ থাকবে, আর আমার উপর দিয়ে তিন দিন অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরও তার একটি দিনার আমার নিকট বাকি থাকবে, কিন্তু আমি তা আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে বন্টন করতে করতে বলবো না, অমুক এত.. অমুক এত.. অমুক এত.. । (এই বলে তিনি তার ডান দিকে, বাম দিকে এবং পিছনের দিকে ফিরলেন।) তবে এমন কিছু বাকি থাকলে থাকতে পারে, যা আমি ঋণ পরিশোধ করার জন্য রেখে দিব। (বর্ণনা করেছেন ইমাম বুখারী রহ:)

ইবনে শিহাব রা: থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

> রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের যুদ্ধ করলেন। অত:পর সাথীদেরকে নিয়ে বের হলেন। হুনায়নের যুদ্ধ সংঘটিত হল। আল্লাহ তার দ্বীন ও মুসলমানদেরকে বিজয় দান করলেন। সেদিন রাসূল ﷺ সফওয়ান ইবনে উমাইয়াকে প্রথমে একশ'টি উট, তারপর একশ'টি এবং তারপর একশ'টি উট দান করলেন।

ইবনে শিহাব বলেন: সায়ীদ ইবনুল মুসায়্যিব আমাদের নিকট বর্ণনা করেন:

> সফওয়ান ইবনে উমাইয়া বলেছেন: আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে এত এত দান করেছেন। অথচ তিনি ছিলেন আমার নিকট সর্বনিকৃষ্ট মানুষ। কিন্তু তিনি সর্বদাই আমাকে দিতে থাকেন, এমনকি একসময় তিনিই আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয় মানুষ হয়ে গেলেন। (বর্ণনা করেছেন ইমাম মুসলিম রহ:)

তার উদারতার আরেকটি চিত্র: রুবাইয়ি বিনতে মুআওয়িয ইবনে আফরা রা: বলেন:

> আমি এক পাত্র খেজুর ও ছোট ছোট কয়েকটি তাজা শশা নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট আসলাম। তিনি আমাকে তার মুষ্ঠি ভরে স্বর্ণালঙ্কার দিলেন। (অথবা স্বর্ণের কথা বলেছিলেন।) তারপর বললেন: তুমি এর দ্বারা অলঙ্কৃত হবে। (বর্ণনা করেছেন ইমাম তাবরানী রহ: আলমু'জামুল কাবিরে)

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট বাহরাইনের সম্পদ আসল। এটাই ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট আগত সবচেয়ে বেশি পরিমাণ সম্পদ। তিনি বললেন এগুলো মসজিদে বন্টন করে দাও। (বর্ণনা করেছেন ইমাম বুখারী রহ:)

তিনি তার সাথীদেরকে এবং তার পরবর্তী উম্মতকেও দানের ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন।

তিনি ﷺ বলেছেন:

> প্রতিদিন যখন বান্দা সকাল বেলা উঠে, তখন দুই জন ফেরেশতা অবতীর্ণ হয়। একজন বলে, হে আল্লাহ দানকারীকে তার অনুরূপ সম্পদ দান কর। অপরজন বলে: হে আল্লাহ দানে কার্পণ্যকারীর মাল ধ্বংস করে দাও। (বর্ণনা করেছেন ইমাম বুখারী রহ:)

আমরা এখানে সাহাবায়ে কেরামের দানের কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরবো:

আবু বকর রাযিআল্লাহ আনহু: নবীদের পরে যে ব্যক্তি সর্বোচ্চ সম্মান অর্জন করেছিলেন, তিনি হলেন আবু বকর রা:। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ: বলেন: আবু বকর রা: নবীদের পরে সর্বশ্রেষ্ঠ ওলী ও তাওয়াক্কুলকারী। তিনি তার সমুদয় সম্পদ খরচ করেছিলেন। নবী ﷺ তাকে বলেছিলেন, তুমি তোমার পরিবারের জন্য কি রেখে এসেছো? তিনি বলেছেন, তাদের জন্য আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলকে রেখে এসেছি। এতদসত্ত্বেও তিনি কারো থেকে সদকা, গনিমতের অর্থ, মান্নতের অর্থ ইত্যাদি কোন কিছুই গ্রহণ করতেন না। তিনি নিজ উপার্জনে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

কিন্তু যে সমস্ত লোকেরা তাওয়াক্কুলের দাবি করে এবং আবু বকর সিদ্দীক রা: এর অনুসরণের দাবি করত: নিজের সমস্ত সম্পদ ব্যায় করে দেয়, অথচ আবার কখনো চেয়ে, কখনো চাওয়া ছাড়া মানুষ থেকে অর্থ গ্রহণ করে, তাদের এ অবস্থা কখনো আবু বকর রা: এর অবস্থার মত নয়।

আবু বকর রা: এর ব্যাপারেই নাযিল হয়েছে আল্লাহ তা'আলার বাণী–

وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى

এ থেকে দূরে রাখা হবে খোদাভীরু ব্যক্তিকে, যে আত্মশুদ্ধির জন্যে তার ধনসম্পদ দান করে।- (লাইল:১৭,১৮)

ইবনুল জাওযী রহ: বলেন:

আলেমগণ এ ব্যাপারে ঐক্যমত্য পোষণ করেছেন যে, এই আয়াতটি আবু বকর রা: এর ব্যাপারে নাযিল হয়েছে।

আবু হুরায়রা রা: থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

কোন সম্পদ আমাকে কখনো এতটা উপকার করেনি, যতটা আবু বকরের সম্পদ আমাকে উপকৃত করেছে। একথা শুনে আবু বকর রা: কেঁদে ফেললেন এবং বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমি ও আমার সম্পদ তো আপনার জন্যই! (বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমাদ রহ:)

উসমান রা: যিনি তাবুকের সেনাবাহিনীর খরচ বহন করেছিলেন, রূমা কূপ ক্রয় করেছিলেন এবং নিজের খাটি মাল দিয়ে মসজিদ সম্প্রসারণ করেছিলেন। সুমামা ইবনে হাযান আলকুশায়রী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

যেদিন উসমান রা:কে শহীদ করা হয়েছিল, সেদিন আমি দারে উপস্থিত হই, তিনি তাদের দিকে উকি দিয়ে বললেন: তোমাদের সেই দুই সাথীকে আমার নিকট ডাক, যারা তোমাদেরকে আমার বিরুদ্ধে প্ররোচিত করেছে। উক্ত দুইজনকে তার সামনে ডাকা হল।

তিনি বললেন: আমি তোমাদেরকে আল্লাহর শপথ দিয়ে বলছি, তোমরা কি জান, রাসূল ﷺ যখন মদীনায় আসলেন, তখন মসজিদে মুসল্লিদের সংকুলান হচ্ছিল না।

তখন রাসূল ﷺ বললেন: কে নিজের খাটি মাল দিয়ে এই ভূমিটি ক্রয় করবে, অত:পর তা মুসজিদের জন্য এমনভাবে দান করে দিবে যে, উক্ত ভূমিতে সেও অন্যান্য মুসলিমদের মতই হবে আর তার জন্য থাকবে জান্নাতে এর চেয়ে উত্তম বিনিময়, তখন আমি আমার খাটি মাল থেকে তা ক্রয় করে মুসলমানদের জন্য দান করেছিলাম, আর এখন তোমরা আমাকে সেখানে দু'রাকাত নামায পড়তে দিচ্ছো না।

অত:পর বললেন: আমি তোমাদেরকে আল্লাহর শপথ দিয়ে বলছি, তোমরা কি জান, রাসূল ﷺ যখন মদীনায় আসলেন, তখন সেখানে রূমা কূপ ছাড়া মিঠা পানির কোন কূপ ছিল না, তখন রাসূল ﷺ বললেন: কে তার খাটি সম্পদ থেকে তা ক্রয় করবে, অত:পর উক্ত কূপে তার বালতিও অন্যান্য মুসলিমদের বালতির মত হয়ে যাবে, আর তার জন্য থাকবে জান্নাতে এর চেয়ে উত্তম বিনিময়?

তখন আমি আমার খাটি সম্পদ থেকে তা ক্রয় করি। আর এখন তোমরা আমাকে তার থেকে একটু পানি পান করতে বাঁধা দিচ্ছো। অত:পর বললেন: তোমরা কি জান, আমি সংকটের (তাবুকের) যুদ্ধের বাহিনীর সদস্য ছিলাম? তারা বলল, হ্যাঁ (এগুলো জানি)। (বর্ণনা করেছে ইমাম আহমাদ রহ:)

আব্দুর রহমান ইবনে সামুরা রা: থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

উসমান রা: এক হাজার দিনার নিয়ে নবী ﷺ এর নিকট আসলেন। হাসান ইবনে ওয়াকি বলেন: আমার কিতাবের অন্য জায়গায় ছিল: যখন তিনি তাবুকের সেনাবাহিনীর খরচ দিয়েছিলেন, তখন তিনি তার আস্তিনে করে এক হাজার দিনার নিয়ে রাসূল ﷺ এর নিকট আসেন।

অত:পর তা রাসূল ﷺ এর কোলে রাখেন। আব্দুর রহমান বলেন: আমি দেখলাম রাসূল ﷺ আমাদেরকে তার কোলের দিকে ফেরাচ্ছেন আর বলছেন: আজকের পর উসমান যে আমলই করুক, তা তার কোন ক্ষতি করবে না। এটা তিনি দু'বার বলেন। (বর্ণনা করেছেন ইমাম তিরমিযী রহ:)

আবু তালহা: যিনি তার সবচেয়ে প্রিয় মাল দান করেছিলেন। আনাস ইবনে মালেক রা:থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আবু তালহা ছিলেন মদীনার আনসারদের সর্বাপেক্ষা বেশি খেজুর সম্পদের অধিকারী। তার নিকট তার সবচেয়ে প্রিয় মাল ছিল তার 'বাইরুহা' নামক খেজুর বাগানটি। এটা ছিল মসজিদের সামনের দিকে। রাসূল ﷺ তাতে প্রবেশ করতেন, তার স্বচ্ছ পানি করতেন।

আনাস রা: বলেন:

অত:পর যখন এই আয়াতটি নাযিল হল-

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ

“তোমরা কিছুতেই পুণ্যের নাগাল পাবে না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তু হতে (আল্লাহর জন্য) ব্যয় কর।”

তখন আবু তালহা রা: রাসূল ﷺ এর নিকট গিয়ে বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমার নিকট আমার সবচেয়ে প্রিয় মাল বাইরুহা। আমি সেটা আল্লাহর জন্য সদকা করে দিলাম। আমি আল্লাহর নিকট এর সঞ্চয় ও সওয়াব কামনা করি। তাই হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ আপনাকে যেখানে খরচ করতে বলেন, আপনি তা সেখানেই ব্যয় করুন।

বর্ণনাকারী বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন:

বাহ! এ তো লাভজনক সম্পদ! এ তো লাভজনক সম্পদ! তুমি যা বলেছো আমি শুনেছি। আমার রায় হল, তুমি তা তোমার নিকটাত্মীয়দের মাঝে ব্যয় করবে।

আবু তালহা বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমি তাই করব। অত:পর আবু তালহা তা তার নিকটাত্মীয় ও চাচাতো ভাইদের মাঝে বন্টন করে দিলেন। (বর্ণনা করেছেন ইমাম বুখারী ও মুসলিম রহ:)

সাহাবায়ে কেরামের জীবনীর মধ্যে এরূপ দানশীলতার ঘটনা অনেক রয়েছে। কেউ আরও দেখতে চাইলে সিয়ারের কিতাবসমূহ দ্রষ্টব্য।

বর্তমানে মুসলিমগণ তাদের শাসকদের দুর্নীতির বলি হয়েছে। তারাই নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থে, বরং তাদের পশ্চিমা প্রভুদের স্বার্থে মুসলমানদের বিস্তৃত সম্পদসমূহ লুণ্ঠন করছে। অত:পর ঐ সমস্ত লুণ্ঠিত অর্থের মাধ্যমেই মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে।

আল্লাহর শপথ! এরা মুসলমানদের মাঝে কি যে দারিদ্র্য-দুর্দশা ও অভাব সৃষ্টি করেছে, তার বর্ণনা দিতে ভাষা অক্ষম। তাদেরকে জীবিকা নির্বাহের সামান্য এক লোকমা খাবার জোগারের জন্য দিনের দীর্ঘ সময় পরিশ্রম ও কষ্ট-ক্লেশে ব্যয় করতে কাটাতে বাধ্য করেছে।

এভাবে তাদেরকে তাদের জাতি গঠনের ভূমিকার কথাই ভুলিয়ে দিয়েছে। তাদের অন্তরে তাদের দেশের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করেছে। কারণ এখানে থেকেই তো তাদের কষ্টের পর কষ্ট করতে হয়। এভাবে যে জনগণের পক্ষ থেকে তাদের উপর আক্রমণ আসার কথা ছিল, তারা তাদেরকে আত্ম-চিন্তায় ব্যস্ত করে দিয়েছে।

কিন্তু এসব কিছু কার স্বার্থে করা হচ্ছে? এসবের অন্তরালে কে আছে? আপনারাই ফলাফল বের করুন! এজন্য শাসকের দানশীলতা ও তার কর্তৃক প্রজাদের স্বার্থের জন্য নিজ স্বার্থকে কুরবানী দেওয়ার কি অর্থ তা কি আপনারা বুঝেছেন? নিশ্চয়ই এটা সহজ নয়। একমাত্র যে আল্লাহকে ভয় করে তার পক্ষেই সম্ভব।

রাসূল ﷺ বলেন:

হে আল্লাহ! যে আমার উম্মতের কোন কিছুর দায়িত্বশীল হয়, অত:পর সে তাদের উপর কষ্ট আরোপ করে, তুমিও তার উপর কষ্ট আরোপ কর। আর যে আমার উম্মতের কোন কিছুর দায়িত্বশীল হয়, অত:পর সে তাদের প্রতি দয়াশীল হয়, তুমিও তার প্রতি দয়াশীল হও। (বর্ণনা করেছেন ইমাম বুখারী রহ:)

আবু মারইয়াম আলইযদী রা: থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি:

যাকে আল্লাহ মুসলমানদের কোন কিছুর দায়িত্বশীল বানান, অত:পর সে তাদের প্রয়োজন, অভাব ও দারিদ্র্য দূর করে না, আল্লাহ তা'আলাও কিয়ামতের দিন তার প্রয়োজন, অভাব ও দারীদ্র্য দূর করবেন না।

একারণে মুআবিয়া রা: মানুষের প্রয়োজনাদী শোনার জন্য একজন লোককে নিয়োজিত করেছিলেন। (বর্ণনা করেছেন ইমাম আবু দাউদ, তিরমিযী, হাকিম, ইবনে সাদ ও বায়াহাকী রহ:)

আজ আমাদের কত প্রয়োজন আলী(রাদ্বি)র মত একজন মহান ব্যক্তির। যিনি তার গভর্ণরদেরকে কোন এলাকায় পাঠানোর সময় বলতেন:

> "পাখীদের মাঝে মৌমাছি যেমন, তোমরাও মানুষের মাঝে তেমন হয়ে যাও। প্রতিটি পাখিই মৌমাছিকে দুর্বল পায়। কিন্তু পাখীরা যদি জানত, মৌমাছির পেটের মাঝে কি বরকত রয়েছে, তাহলে তারা কিছুতেই এরূপ করত না।
>
> তোমরা যবান ও শরীরের দিক দিয়ে মানুষে সাথে মিশবে আর তোমাদের আমল ও অন্তরের দিক দিয়ে তাদের থেকে দূরে থাকবে। কারণ প্রত্যেক মানুষ যা অর্জন করে, তা ই পায় এবং কিয়ামতের দিন সে যাকে ভালবেসেছিল তার সাথেই থাকবে। (বর্ণনা করেছেন ইমাম দারেমী।)

উমার ইবনে আব্দুল আযীযের মত লোকের কত প্রয়োজন আমাদের, যিনি বলতেন,

> তোমরা পাহাড়ের চূড়ায় গম ছড়িয়ে দাও, যেন কারো একথা বলার সুযোগ না থাকে যে, মুসলমানদের দেশে একটি পাখিও ক্ষুধার্থ থেকেছে!

পরিশেষে হে মুসলিমগণ!

আপনাদের উদ্দেশ্যে বলছি: আমরা আজ আপনাদের দানশীলতার মুখাপেক্ষী। আপনাদের ধনীদের অথের মুখাপেক্ষী, যেন তা আপনাদেরই জাতির জন্য ব্যায় করা যায়। অন্যথায় আপনারা আল্লাহর শপথ দিয়ে বলুন, যদি আপনারা তাদের দায়িত্ব বহন না করেন, তাহলে কে বহন করবে?

আপনারা কি শাসকদের বা পশ্চিমাদের অপেক্ষায় বসে আছেন, যে তারা উম্মাহর পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অর্থায়ন করবে। আমি শুধু মুসলিম জনসাধারণের উপর চাপিয়ে দেওয়া সেই দারীদ্র্যের কথা বলছি না, যা তাদেরকে তাদের সেই দায়িত্বের কথাও ভুলিয়ে দিয়েছে, যার জন্য আল্লাহ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন; বরং আমি সব জিনিসের মূল ও গোড়ার কথা বলছি।

সেই সেনাবাহিনী, যারা উম্মাহকে সম্মানের পথে চালাতে ও বর্তমান অধ:পতন থেকে উত্তোরণ করতে সর্বদা উদগ্রীব, কিন্তু দারীদ্র্য তাদেরকে থমকে দিচ্ছে। এরা তো আপনাদের বীজ, তাই আপনারা সকলে এদের মাঝে পানি সিঞ্চন করার কাজে ব্যস্ত হোন।

যেন এমন বৃক্ষ দেখে আপনাদের চক্ষু শীতল হয়, যার শিকড় মাটিতে স্থির, আর শাখা-প্রশাখা আকাশে ছড়িয়ে পড়েছে, যা স্বীয় প্রভুর ইশারায় সর্বদা ফল দিতে থাকে এবং যা আপনাদের সকল দু:খ-দুর্দশার অবসান ঘটাবে।

আমার এই কথাগুলো যাদের অন্তরে সামান্য রেখাপাত করবে, তাদের নিকট আমার আবেদন: সেই সেনাবাহিনীর ব্যাপারে গভীর চিন্তা করুন, যারা শুধু মাত্র আপনাদের নবী ﷺ, তার সাহাবা ও তার পরিবারবর্গের পদচিহ্ন ধরেই চলছেন!! তারা আপনাদের কাছে আমানত।

পঞ্চম গুণ: الحزم (দৃঢ়তা)

'আল-হাযম' বা 'দৃঢ়তা' এর আভিধানিক অর্থ, মানুষের নিজ বিষয়কে নিয়ন্ত্রণ করা এবং মজবুতভাবে ধরা। 'আলহাযম=বাঁধা, মজবুত করা' থেকে এর উৎপত্তি। যেমন বলা হয়: **رجل حازم** 'দৃঢ় প্রত্যয়ী লোক', যখন লোকটি স্বীয় মতামত ও সিদ্ধান্তে অটল থাকে, তা থেকে মচকে যায় না।

তার আরেকটি অর্থ হল কোন কাজের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা। আবার 'কুধারণা' বলেও একে সংজ্ঞায়িত করা হয়। এ সকল অর্থগুলোর মাঝে যোগসূত্র স্পষ্ট। যেহেতু দৃঢ়প্রত্যয়ী লোক সতর্ক ও বিচক্ষণ বলেই প্রসিদ্ধ। ফলে তাকে আপনি এতটা সাদামাটা পাবেন না যে, মন্দাচারীদের ব্যাপারের সর্বদা সাফাই গাইতে থাকবে।

বরং সে থাকবে সতর্ক ও জাগ্রত, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে কুধারণাও করতে জানে। যাকে প্রতিহত করতে হবে, উপযুক্ত সময়ে তাকে প্রতিহত করতে প্রস্তুত ও সমার্থ্যবান থাকে। অত:পর তাদের মন্দের মাত্রা অনুযায়ী তাদের উপর কঠোরও হতে পারে। এভাবে সে সর্বাদা নিজ বিষয়দির উপর নিয়ন্ত্রণকারী ও সমর্থবান থাকে।

তার পারিভাষিক অর্থ হল: অপরাধীদের উপর কঠোরতা করার ক্ষেত্রে দৃঢ় হওয়া, তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব না করা, তাদের সাফাই না গাওয়া এবং তাদের প্রতি ভাল ধারণা পোষণ না করা।

আর তার সীমা হচ্ছে: বন্ধু-শত্রু চিনতে পারা এবং ভুলে অপরাধকারী ও ইচ্ছাকৃত অপরাধে নিমজ্জিতদেরকে সঠিকভাবে শনাক্ত করতে পারা।

একজন নেতার জন্য প্রত্যাশিত গুণগুলোর মধ্যে অন্যতম হল দৃঢ়তার গুণ। এটি একটি সুস্পষ্ট বিষয়, প্রকৃতিগতভাবেই বোঝা যায়। কেননা নেতার জন্য অপাত্রে সব সময় নম্রতা অবলম্বন করা দুষণীয়।

তবে এখানে বুঝতে হবে, কাঙ্খিত দৃঢ়তা হল, উপযুক্ত ক্ষেত্রে দৃঢ় হওয়া। এমনিভাবে কাঙ্খিত নম্রতাও সেরূপ। কিন্তু দু'টি দল এতে বিভ্রান্ত হয়েছে। একদল শৈথিল্য করেছে। আরেক দল অতি বাড়াবাড়ি করেছে। আর প্রত্যাশিত পন্থা হল মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নাহর দলিলের উপর আমল করা।

নেতার দৃঢ়তায় মুসলিমদের জন্য বহুবিধ উপকার রয়েছে। শাসকের মাঝে যদি এই গুণের অনুপস্থিতি থাকে, তাহলে তা মুসলিমদের জন্য ধ্বংসাত্মক। আর তিনি যদি উল্লেখিত মহান বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত হন, তাহলে তার প্রমাণ হবে তখন, যখন তিনি তার সঠিক মতটিকে বিরোধীদের উপর কার্যকর করতে পারবেন।

যদিও বিরোধিতাকারীরা তার নিকটবর্তী হয়, তার থেকে অধিক মর্যাদাবান হয় অথবা তাদের থেকে বিদ্রোহের আশঙ্কা করা হয়। নেতার এরূপ হওয়ার কোন বিকল্প নেই।

কারণ তিনি তো এমন হবেন যে, আল্লাহর ব্যাপারে কাউকে ভয় করবেন না, যেকোন কিছুর উপর উম্মাহর স্বার্থকে প্রাধান্য দিবেন। আদর্শ নেতা তিনিই, যিনি প্রতিটি অবস্থায় হকের অনুসন্ধান করেন এবং নিজের ভুল প্রকাশিত হলে হকের দিকে ফিরে আসতে ও তাকে মজবুতভাবে আকড়ে ধরতে কোন আপত্তি থাকে না। যদিওবা তা তার উপর কষ্টকর হয়, সবাই তার পাশ থেকে চলে যায়। তিনিই হলেন দৃঢ়প্রত্যয়ী নেতা।

রাসূল ﷺ এর দৃঢ়তার একটি উদাহরণ হল কবি আবু ইজ্জার সাথে তার আচরণ। ইমাম মুসলিম রহ: তার সহীহে বর্ণনা করেন:

> রাসূল ﷺ আবু ইজ্জাকে বদর যুদ্ধের সময় বন্দী করেন। তারপর তার প্রতি অনুগ্রহ করে তাকে ছেড়ে দেন এবং তার থেকে এই প্রতিশ্রুতি নেন যে, সে মুসলিমদের বিরুদ্ধে উস্কানি দিবে না ও তাদের কুৎসা রটনা করবে না। কিন্তু তাকে ছেড়ে দেওয়ার পর সে আপন কওমের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হয়ে আবার মুসলিমদের বিরুদ্ধে উস্কানী দিতে থাকে এবং তাদের কুৎসা রটাতে থাকে।
>
> অত:পর ওহুদ যুদ্ধে আবার তাকে বন্দী করা হল। তখন সে অনুগ্রহ করার আবেদন করল। রাসূল ﷺ বললেন: **মুমিন এক গর্তে দু'বার দংশিত হয় না।**

ইমাম মুসলিম রহ: রাসূলুল্লাহ ﷺ এর উপরোক্ত উক্তির ব্যাখ্যায় বলেন:

"অর্থাৎ সে ই হল প্রশংসিত মুমিন, দূরদর্শী ও দৃঢ়প্রত্যয়ী মুমিন, যে এমন উদাসিন হয় না যে, অসচেতনতার কারণে একবারের পর দ্বিতীয় বার ধোঁকা খাবে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, মুমিন সতর্ক হওয়ার জন্য একবার ধোঁকা খেতে হবে, বরং তাকে অবশ্যই মন্দাচারীদের গতিবিধি সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে, তাদের গতিবিধি মন্দ পরিলক্ষিত হলে তাদের ব্যাপারে অনমনীয় হতে হবে।

তথাপি যদি একবার ভুল করে ফেলে, তাহলে দ্বিতীয় বার আর অপাত্রে সুধারণা পোষণ করবে না। ফলে একই ব্যক্তি দ্বারা দু'বার প্রতারিত হবে না।"

অনুরূপ, তার আরেকটি দৃষ্টান্ত হল, বনু কুরাইজার ইহুদীদের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর অনমনীয় আচরণ। ইমাম বুখারী রহ: হযরত আবু সাঈদ খুদুরী রা: থেকে বর্ণনা করেন: তিনি বলেন:

> বনু কুরাইজা সা'দ ইবনে মুআযের ফায়সালার ব্যাপারে সম্মত হল। রাসূলুল্লাহ ﷺ সা'দের নিকট লোক পাঠালেন। সা'দ রা: একটি গাধার পিঠে চড়ে আসছিলেন। তিনি মসজিদের নিকটবর্তী হলে রাসূল ﷺ আনসারদের উদ্দেশ্যে বললেন: তোমাদের নেতার (বা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির)দিকে এগিয়ে যাও।

অত:পর তিনি সা'দকে বললেন: এরা তোমার ফায়সালার ব্যাপারে সম্মত হয়েছে। তিনি বললেন: তাদের যুদ্ধক্ষম পুরুষদেরকে হত্যা করা হবে এবং নারী শিশুদেরকে বন্দী করা হবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: 'তুমি তো আল্লাহর উদ্দিষ্ট ফায়সালা করলে' বা এরকম বলেছেন: 'মালিকের উদ্দিষ্ট ফায়সালাই করলে।

আল্লাহর কিতাবে দৃঢ় অবস্থানের একটি উদাহরণ হল: মূসা আ:এর কওম ও সামিরীর সাথে মূসা আ:এর ঘটনাটি।

মূসা আ: যখন তূর পর্বতে আল্লাহর সঙ্গে নির্জনালাপের পর আল্লাহর বাণী সংবলিত কাষ্ঠ খন্ড নিয়ে ফিরলেন। আর ইতিমধ্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে জানতে পারলেন যে, তার কওম গো-বৎসের ইবাদত শুরু করেছে, তখন তিনি ঘটনাটি স্বচক্ষে দেখার পর নিজ ভাইয়ের নিকট গেলেন।

তিনি ধারণা করেছিলেন, তার ভাই অন্যায়ে বাঁধা দিতে শৈথিল্য করেছে এবং সে সামিরী ও তার কওমের ব্যাপারে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেননি। কারণ তিনি তার প্রভুর নির্দিষ্ট মেয়াদ পূর্ণ করার জন্য যাওয়ার সময় তার ভাই হারুনকে তার কওমের উপর তার স্থলাভিষিক্ত করে গিয়েছিলেন।

যেমনটা আল্লাহ তা'আলা বলছেন:

وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ

"আমি মূসার জন্য ত্রিশ রাতের মেয়াদ স্থির করেছিলাম (যে, এ রাতসমূহে তুমি তূর পাহাড়ে এসে ইতিকাফ করবে)। তারপর আরও দশ দ্বারা তা পূর্ণ করি। এভাবে তার প্রতিপালকের নির্ধারিত মেয়াদ চল্লিশ রাত হয়ে গেলে এবং মূসা তার ভাই হারুনকে বলল, আমার অনুপস্থিতিতে তুমি আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে আমার প্রতিনিধিত্ব করবে, সবকিছু ঠিকঠাক রাখবে এবং অশান্তি সৃষ্টিকারীদের অনুসরণ করবে না।" (আরাফ:১৪২)

তিনি যখন ফিরে দেখলেন, তার কওম কি সব আবিস্কার করেছে, তখন তিনি তার উপর ক্রোধান্বিত হলেন, যেহেতু তার ধারণা ছিল, সে অন্যায়ে বাঁধা দিতে শৈথিল্য করেছে। আর কেউ বলেছেন তিনি ক্রোধান্বিত হয়েছেন, তার পক্ষ থেকে শুধু মৌখিক বাঁধা দিয়ে ক্ষান্ত থাকার কারণে, কার্যকরী বাঁধা দেওয়ার ব্যাপারে ত্রুটি করার কারণে।

সম্ভবত প্রথম কথাটিই অগ্রগণ্য। এর দলিল হল: তিনি ﷺ তার ভাইয়ের নিকট এই ওযর পেশ করেছিলেন যে, তার কওমের কাছে সে অসহায় পড়েছিল এবং তারা তাকে হত্যা করার উপক্রম ছিল। অর্থাৎ তিনি তাদেরকে এত কঠিন ভাবেই প্রতিবাদ করেছিলেন যে, তারা তাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়।

আর কেউ কেউ বলেন: তিনি কোমল ছিলেন অর্থাৎ কঠোর সংকল্প, দৃঢ় ইচ্ছা ও আত্মপ্রত্যয়ের ক্ষেত্রে মূসার চেয়ে কম ছিলেন। একারণেই কওম তার কথা শোনেনি; বরং তাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে।

এখান থেকে এই শিক্ষাটি অর্জন হয় যে, নেতার অবশ্যই অধীনস্তদের ব্যাপারে দৃঢ় হতে হবে। তবে ন্যায়ানুগ দৃঢ়তা। যে দৃঢ়তা উপযুক্ত স্থানে হয়।

অনুরূপ এখানে ফেৎনার হোতা সামিরীর সাথে তার দৃঢ়তা ও কঠোরতার চিত্রও কয়েক দিক থেকে ফুটে উঠে:

প্রথমত: তার ক্রোধ ও কঠিন ভাষা। কারণ তিনি "মা খাতবুকা" বলে তার কাজের ভয়াবহতা তুলে ধরেছেন। যেহেতু 'খাতবু' শব্দটির অর্থ হল ভয়ংকর বা গুরুতর বিষয়। সামিরী তার জবাবে বলেছিল, যা কুরআন বর্ণনা করেছে:

قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي

"সে বলল, আমি এমন একটি জিনিস দেখেছিলাম, যা অন্যদের নজরে পড়েনি। তাই আমি রাসূলের পদচিহ্ন থেকে এক মুঠো তুলে নিয়েছিলাম। সেটাই আমি (বাছুরের মুখে) ফেলে দেই। আমার মন আমাকে এমনই কিছু বুঝিয়েছিল।"

অর্থাৎ আমার প্রভূর নির্দেশেও নয় অথবা কোন বর্ণনাগত বা যৌক্তিক প্রমাণের দ্বারাও নয়। সে যখন এরূপ কথা বলল: তখন

দ্বিতীয় পদক্ষেপে নবী মূসা আঃ তাকে পরিত্যাগ করার এবং কেউ তার সাথে কথাবার্তা না বলা ও তার সাথে মেলামেশা না করার আদেশ জারি করলেন। যেমন কুরআনে বর্ণিত হয়েছে-

فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ

"মূসা বলল, তুমি চলে যাও। জীবনভর তোমার কাজ হবে মানুষকে এই বলতে থাকা যে, আমাকে ছুঁয়ো না।"

এটাকেই বর্তমানে আমাদের যামানায় 'নগর নির্বাসন' বলা হয়।

তৃতীয়ত: তারপর তিনি তাকে কিয়ামতের কঠিন আযাবের ধমকি দেন-

وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَه

"আর তোমার জন্য আছে এক প্রতিশ্রুত কাল, যা তোমার থেকে টলানো যাবে না।"

আর যেহেতু তার এই বিদআতের ক্ষতিটা শুধু তার মাঝেই সীমবদ্ধ থাকেনি, বরং তা বনী ইসরাঈলীদের মাঝেও ছড়িয়েছে, এজন্য তাদের সামনেই তার এই সংশয়টির মূলোৎপাটন করা জরুরী ছিল। আর তা তিনি এভাবে করেছেন:

চতুর্থত: গো-বৎসকে জালিয়ে ভস্ম করে উড়িয়ে দেওয়া। তিনি তা এমনভাবে জালিয়ে দিলেন যে, তার কোন আকৃতিই বাকি রাখলেন না, তাকে সমুদ্রে উড়িয়ে দিলেন, যাতে তার এমন কোন চিহ্ন অবশিষ্ট না থাকে, যার দ্বারা আবার তা সূচনা হতে পারে।

মূসা আঃ গুড়ো করে উড়িয়ে দেওয়ার কথাটি খুব জোর দিয়ে বলেছেন, বনী ইসরাঈলের মন থেকে এর উপাস্য হওয়ার সংশয় সমূলে দূর করার জন্য। এখানে মূসা আঃ কল্পিত উপাস্যের ক্রোধের আশঙ্কা করেননি। একারণেই তাকে গুড়ো করে উড়িয়ে দিতে কোন দ্বিধা-দ্বন্ধ করেননি।

তাদের অন্তরে যে সংশয় স্থান করে নিয়েছিল, তা উৎখাত করতে সম্ভবত এটাই ছিল সম্ভাব্য চূড়ান্ত কর্মপন্থা। আর প্রতিটি যুগেই সামিরীর মত বিদআতি ও অন্যান্য ভ্রান্ত লোকদের সাথে এমনটাই করা উচিত।

ইমাম কুরতুবী রহঃ বলেন:

> বিদআতি ও পাপিষ্ঠদেরকে নির্বাসন দেওয়া, পরিত্যাগ করা ও তাদের সাথে মেলামেশা না করার ব্যাপারে এই আয়াতটিই দলিল। এটা হচ্ছে এমন বিদআতির ক্ষেত্রে, যে আপন বিদআতের প্রতি মানুষকে আহ্বান করে।

কুরআনে কারীম এই নীতিটি অত্যন্ত দৃঢ় ও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে, যা পাঠককে এই দীক্ষা দেয় যে, এসকল ক্ষেত্রে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

তারপর ফিৎনার শিকড়সহ উপড়ে ফেলতে হবে অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিতে, যেন কোন অলসতা ও দ্বিধা-দ্বন্ধ না থাকে। এই বিষয়টিকে নিশ্চিহ্ন করার ক্ষেত্রে মূসা আঃ এর কর্মপন্থা ছিল অনড় ও সুস্পষ্ট। এটাই দৃঢ়তার অর্থ, যার ব্যাপারে আমাদের আলোচনা ।

খলীফায়ে রাশেদ আবু বকর রাঃএর দৃঢ়তার উদাহরণ হল: রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মৃত্যুর পর মুরতাদদের সাথে তার যুদ্ধ করা। বিভিন্ন রূপী মুরতাদদের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বেড়ে গিয়েছিল। কেউ নবুওয়াত দাবি করেছে, কেউ যাকাত অস্বীকার করেছে, কেউ নামায বাতিল করে দিয়েছে।

তখন এই নেতার পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছিল দৃঢ় পদক্ষেপ। পক্ষান্তরে হযরত উমার রাঃ যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সংকোচবোধ করছিলেন। কারণ তারা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলে। তাই আবু বকর রাঃকে বললেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ তো বলেছেন:

“আমাকে আদেশ করা হয়েছে আমি যেন লোকদের সাথে যুদ্ধ করি, যতক্ষণ না তারা একথার সাক্ষ্য দেয়: আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। যে তা বলল, সে আমার থেকে তার সম্পদ ও রক্ত নিরাপদ করে নিল। তবে আল্লাহর হকের কথা আলাদা। আর তার হিসাব আল্লাহর দায়িত্বে।”

তাহলে আপনি কিভাবে মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন।

আবু বকর রা: বললেন: আল্লাহর শপথ! যে নামায ও যাকাতের মাঝে কোন পার্থক্য করে, আমি তার বিরুদ্ধে অবশ্যই যুদ্ধ করবো। কারণ যাকাত হল সম্পদের হক। আল্লাহর শপথ! তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যামানায় যে বকরীর বাচ্চার যাকাত দিত, এখন যদি তাও দিতে অস্বীকার করে, তাহলে আমি তা না দেওয়ার কারণে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো। (বর্ণনা করেছেন ইমাম বুখারী রহ:)

মুরতাদদের সাথে আবু বকর রা: এর এই অনমনীয় আচরণের মধ্যে দ্বীন ও উম্মাহর অশেষ কল্যাণ নিহিত ছিল। তিনিই ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তিগুলো দৃঢ় করেছিলেন, ইসলামী রাষ্ট্রকে সকল আভ্যন্তরীণ শত্রুদের থেকে ও যারা নিজ প্রবৃত্তিকে উপাস্য বানাতে চেয়েছিল, তাদের থেকে মুক্ত করেছিলেন।

আর একারণেই বহি:শত্রুদের সাথে লড়াই করার জন্য তিনি অবসর হতে পেরেছিলেন। আমরা এই কর্মপন্থাগুলোর প্রতি তাকালে তাতে এমন হিকমাহ ও দৃঢ়তা দেখতে পাই, যা মুসলমানদের অনেক নেতার মাঝে পাওয়া যাওয়া দুস্কর। সুতরাং উমার রা: ও যারা তার সমচিন্তা পোষণ করত, তাদেরকে থামিয়ে দেওয়ার মাঝেই ছিল হিকমত।

নিশ্চয়ই মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ও প্রবৃত্তি পূজার সমাপ্তি ঘটনানোর মধ্যেই ছিল দৃঢ়তা। অন্যথায় হয়ত এটা রাষ্ট্রের ঐক্যকে চুরমার করে দিত, তার ভীত নড়বড়ে করে দিত।

আমীরুল মুমিনীন হযরত উমার রা: এর দৃঢ়তার একটি উদাহরণ হল: তিনি ইসলামে প্রবেশ করার সর্বপ্রথম মূহূর্তে যা করেছিলেন। ইবনে আব্বাস রা: থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

আমি উমারকে জিজ্ঞেস করলাম: আপনাকে কেন ‘ফারুক’ বলে নাম দেওয়া হয়েছে? তিনি বললেন: হামযা আমার তিন দিন পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। তারপর আল্লাহ আমার অন্তরকেও ইসলামের জন্য প্রশস্ত করে দেন। আমি বললাম: আল্লাহ ছাড়া কোর উপাস্য নেই, তার রয়েছে সুন্দর নামসমূহ। তখন আমার নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ব্যক্তিত্ব থেকে প্রিয় ব্যক্তিত্ব আর কেউ রইল না।

আমি বললাম: আল্লাহর রাসূল কোথায়? আমার বোন বলল: তিনি সাফা পাহাড়ের নিকটবর্তী আরকাম ইবনে আরকামের বাড়ীতে আছেন। আমি উক্ত বাড়ীতে আসলাম। হামযা তার সঙ্গীদের সাথে উক্ত বাড়ীতে বসা ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘরে ছিলেন। আমি দরজায় আঘাত করলে সকলে জমা হয়ে গেল। হামযা সকলকে বলল: তোমাদের কি হয়েছে? সকলে বলল: উমার এসেছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কাপড়ের গুচ্ছ ধরে তাকে ঝাড়া দিলেন। তিনি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর হাটুর উপর পড়ে গেলেন।

তারপর রাসূল ﷺ বললেন: হে উমার! তুমি কি বিরত হবে না? তিনি বলেন: তখন আমি বললাম: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি একক, তার সাথে কোন শরীক নেই এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তার বান্দা ও রাসূল। তিনি বলেন: তখন পুরো বাড়ী তাকবীর ধ্বক্ষনিতে কেঁপে উঠল, যা মসজিদে অবস্থিত লোকেরাও শুনতে পেল।

তিনি বলেন: তখন আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি জীবনে-মরণে সত্যের উপর নই? রাসূল ﷺ বললেন: নিশ্চয়ই, সেই সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ। নিশ্চয়ই তোমরা জীবনে-মরণে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আছো। তিনি বলেন: তখন আমি বললাম: তাহলে কেন আমরা লুকিয়ে থাকবো? সেই আল্লাহর শপথ! যিনি আপনাকে সত্য দিয়ে প্রেরণ করেছেন, আপনি অবশ্যই বের হবেন।

অত:পর আমরা তাকে দু’টি দলে সারিবদ্ধভাবে বের করলাম। এক সারিতে হামযা আর অপর সারিতে আমি। আমাদের পদচারণায় সেখানে পেষণের গুড়োর ন্যায় ধুলি উড়ছিল। অবশেষে আমরা মসজিদে প্রবেশ করলাম। তিনি বলেন: তখন কুরাইশরা আমার দিকে ও হামযার দিকে তাকালো। ফলে তারা এতটা লজ্জা পেল, যা ইতিপূর্বে কখনো তারা পায়নি। তখন সেদিনই রাসূলুল্লাহ ﷺআমাকে নাম দিলেন ‘ফারুক’ বলে। আল্লাহ তা’আলা হক ও বাতিলে মাঝে পার্থক্য করে দিলেন। (হিলইয়াতুল আউলিয়া-আসবাহানী)

তাই উম্মাহর আজ কত প্রয়োজন এমন একজন লোকের, যে শত্রুর মুখোমুখী এরূপ দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করবে, প্রকাশ্যে হকের দাওয়াত দিবে, উম্মাহর নেতৃত্বের বিকাশ ঘটাবে এবং উম্মাহর দ্বীন, রক্ত ও সম্মান, যা পৃথিবীর দিকে দিকে পদদলিত হচ্ছে, তার পক্ষে প্রতিরোধ করবে।

বিশেষ করে বর্তমানে যখন উম্মাহ নেতৃত্বের লাগামে আটকা আছে, তখন আমাদের এমন একটি আদর্শ নেতৃত্বের বড়ই প্রয়োজন, যিনি আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করবেন, আমাদের কাতারসমূহ এক করবেন, শত্রুদের সাথে আমাদের অবস্থান দৃঢ় করবেন এবং আমাদের আভ্যন্তরীণ ও বহি:রাজনীতিকে ঢেলে সাঁজাবেন।

ষষ্ঠ গুণ: الخطابة (বাগ্মীতা)

وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ

"এবং তাকে দান করেছিলাম প্রজ্ঞা ও মীমাংসাকর বাগ্মিতা।"

'আল-খিতাবাহ' বা 'ভাষণ': এর আভিধানিক উৎপত্তি خطب يخطب خطابة وخطبة فهو خطيب والمفعول مخطوب থেকে।

আর পরিভাষায় 'খিতাবাহ' বলা হয় এমন বক্তব্যকে, যা জনসম্মুখে পেশ করা হয়। অথবা তা বলা হয় এমন কথাকে, যা বক্তা মানুষকে জানানো ও পরিতুষ্ট করার উদ্দেশ্যে মানুষের সামনে পেশ করে।

'বক্তৃতা' বা 'ভাষণ' একটি গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্র। শ্রোতাদের মস্তিস্ক ও হৃদয়ে এর প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে। জনগণের মস্তিস্ককে পরিতুষ্ট ও আশ্বস্ত করতে এবং তাদের বিবেককে নাড়া দেওয়ার জন্য এটাই প্রধান মাধ্যম।

> প্রাচ্য থেকে দু'জন লোক আসল রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট। তারা এমন খৈ ফুটনো ভাষণ দিল যে, লোকজন মন্ত্রের ন্যায় মুগ্ধ হয়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: নিশ্চয়ই কিছু বক্তৃতা যাদু। (বর্ণনা করেছেন ইমাম বুখারী রহ:)

একারণে নেতাদের জন্য এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তারই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন লোকজনকে তার আশেপাশে ভেড়ানোর।

আর এটা তখনই সম্ভব হবে, যখন জনগণ তার কাজ ও কথাবার্তা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা রাখবে। তখনই তিনি তাদেরকে নিয়ে যেতে পারবেন আল্লাহর শাসনের দিকে। যেমনিভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে গিয়েছিলেন।

স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺএর জীবনে বক্তৃতা বা ভাষণের গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন। যেমন তিনি তার নবী মূসা আ: এর ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন:

قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ

"মূসা বলল: হে আমার প্রতিপালক! আমার আশংকা, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে। আমার অন্তর সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে এবং আমার জিহ্বা সাচ্ছন্দে চলে না। সুতরাং হারুনের কাছেও নবুওয়াতের বার্তা পাঠান।" (শুআরা:১২,১৩)

তিনি আরও বলেন:

وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ

"আমার ভাই হারুনের জবান আমার অপেক্ষা বেশি স্পষ্ট। আমার সঙ্গে আমার সাহায্যকারীরূপে তাকেও পাঠিয়ে দিন। যাতে সে আমার সমর্থন করে। আমার আশংকা তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে।" (কাসাস:৩৪)

আল্লামা ইবনে সা'দী রহ: বলেন:

তার জবানে জড়তা ছিল, তার কথা ভালমত বোঝা যেত না। এজন্য তিনি আল্লাহর নিকট দু'আ করেন, যেন আল্লাহ তার জড়তা দূর করে দেন, যাতে মানুষ তার কথা বুঝতে পারে। ফলে বক্তৃতা ও ভাষণের পরিপূর্ণ ফায়দা অর্জিত হয়।

তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন: **قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَامُوسَى** "আল্লাহ বললেন, হে মূসা! তুমি যা কিছু চেয়েছো, তা তোমাকে দেওয়া হল।"

সুতরাং মুখের বক্তৃতা হল আল্লাহ সুবহানাহুর দিকে আহ্বাানের জন্য প্রথম মাধ্যম। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ

"আমি যখনই কোন রাসূল পাঠিয়েছি, তাকে তার স্বজাতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি, যাতে সে তাদের সামনে সত্যকে সুস্পষ্টরূপে তুলে ধরতে পারে।"

যেহেতু নবীদেরকে পাঠানো হত তাদের স্ব স্ব কওমের ভাষাভাষী করে। যাতে তাদের নিকট হককে স্পষ্ট করতে পারেন এবং স্পষ্ট কথামালা ও আকর্ষণীয় উপস্থাপনার দ্বারা তাদের উপর প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন। আর তা কেবল সফল ও উন্নত ভাষণের মাধ্যমেই সম্ভব।

যেমন নবী মূসা আ: দ্বীনী ও রাজনৈতি ভাষণের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। একারণে স্বীয় রবের নিকট আবেদন করেছেন, যেন তিনি তার বক্ষ খুলে দেন এবং জবানের জড়তা দূর করে দেন। তারপর তার সাথে তার ভাই হারুনকেও নবী করে প্রেরণ করলেন। কারণ তিনি তার থেকে অধিক সুস্পষ্টভাষী ছিলেন। ফলে আল্লাহ তার আবেদন মঞ্জুর করেন।

আমাদের রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জীবনেও এমন অনেক ঘটনা পাওয়া যায়, যা এ বিষয়টির গুরুত্ব প্রমাণ করে। সম্ভবত বনু তামিমের প্রতিনিধি দলের আগমনের ঘটনায় ইসলামী দাওয়াতের ক্ষেত্রে বক্তৃতার মহা ফলাফলের স্পষ্ট চিত্র রয়েছে।

মুফাস্‌সির ও ঐতিহাসিকগণ তাদের কিতাবসমূহে ঘটনাটি উল্লেখ করেন: ব্যাপকভাবে প্রতিনিধি দল আগমনের বছর বনু তামিমের প্রতিনিধি দলও মদীনায় আসল।

তারপর তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ কে তাদের দিকে বের হয়ে আসার আহ্বান জানাল।

নিম্নোক্ত আয়াতে তাদের কথাই বলা হয়েছে,

إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

"(হে রাসূল!) তোমাকে যারা কামরার বাইরে থেকে ডাকে, তাদের অধিকাংশেরই বুদ্ধি নেই।" (হুজরাত:৪)

তিনি তাদের দিকে বের হয়ে আসলে তারা বলল: আমরা এসেছি আমাদের বক্তা ও কবির মাধ্যমে আপনার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগীতা করার জন্য।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন:

আমি কবিতা দিয়ে প্রেরিত হইনি। আর আমাকে প্রতিদ্বন্ধিতা করতেও আদেশ করা হয়নি; তবে আপনারা আসুন। তখন যাবারকান ইবনে বদর জনৈক যুবককে বলল: তুমি গর্ব করতে থাক এবং তোমার কওমের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা কর।

তখন সে বলতে লাগল: সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে সমস্ত সৃষ্টির সেরা বানিয়েছেন এবং আমাদেরকে দিয়েছেন অঢেল সম্পদ, যার মাধ্যমে আমরা যাচ্ছে করি। তাই আমরা হলাম ভূ-পৃষ্ঠে সর্বশ্রেষ্ঠ। সর্বাধিক জনসংখ্যা, সম্পদ ও অস্ত্রের অধিকারী। তাই যে আমাদের বিরোধিতা করে, সে আমাদের কথা থেকে উত্তম কথা নিয়ে আসুক বা এমন কোন কীর্তি প্রকাশ করুক, যা আমাদের কীর্তি থেকে উত্তম।

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তার বক্তা সাবিত ইবনে কায়িস ইবনে শাম্মাসকে বললেন: তুমি দাঁড়াও, তার জবাব দাও!

সাবিত ইবনে কায়িস বলতে লাগলেন: "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমি তার প্রশংসা বর্ণনা করছি এবং তার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি। তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করছি, তার উপর ভরসা করছি এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তার বান্দা ও তার রাসূল।"

তিনি মুহাজিরদের মধ্য থেকে তার চাচাত ভাইদেরকে ডাকলেন, যারা ছিলেন সর্বোত্তম চেহারা ও সর্বাধিক জ্ঞানের অধিকারী। তারা তার ডাকে সাড়া দিয়ে বলতে লাগলেন: "সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে তার দ্বীনের সাহায্যকারী, তার রাসূলের সহকারী ও তার দ্বীনের সম্মান প্রতিষ্ঠাকারী বানিয়েছেন।

তাই আমরা মানুষের সাথে যুদ্ধ করি, যাবৎ না তারা এই সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল। সুতরাং যে তা বলে নিল, সে নিজের প্রাণ ও সম্পদ নিরাপদ করে নিল। আর যে তা অস্বীকার করে, আমরা তাকে হত্যা করি। আর তার দায়ভার আমাদের উপর হালকা। আমি আমার এই কথা বলছি আর তার সাথে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি মুমিন নর-নারীর জন্য।"

তারপর তাদের কবি দাড়িয়ে আবৃত্তি করল। হাস্‌সান ইবনে সাবিত রা: তার জবাব দিলেন।

তখন প্রতিনিধি দলের সরদার আকরা ইবনে হাবেস বলল: আল্লাহর শপথ! আমি জানি না, এটা কি জিনিস? আমাদের বক্তা কথা বলল, কিন্তু দেখলাম, তাদের বক্তার কথাই শ্রেষ্ঠ। আমাদের কবি কবিতা আবৃত্তি করল, কিন্তু দেখলাম তাদের কবিই শ্রেষ্ঠ আবৃত্তিকারী ও উত্তম কথা রচনাকারী।

অত:পর রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকটবর্তী হয়ে বলল: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং আপনি আল্লাহর রাসূল। উক্ত প্রতিনিধি দলের ইসলাম গ্রহণে এই ভাষণেরই প্রভাব ছিল।

তবে ভাষণের মধ্যে কিছু শর্ত ও পছন্দনীয় বিষয় আছে, যেগুলো নেতাকে রক্ষা করে চলতে হবে। সেগুলো হল:

১। শব্দ চয়ন করবে যত্ন সহকারে। যথাসম্ভব, তার মনে যেসকল বিষয়গুলো উদিত হয়, তার আলোকেই শব্দ ব্যবহার করবে। আর বক্তা সর্বাধিক সত্যনিষ্ঠ ও নিষ্ঠাবান হওয়ার কোন বিকল্প নেই। কারণ যা অন্তর থেকে বের হয়, তা ই অন্তরে পৌঁছে।

আর এরজন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাকে সম্মানিতও করা হয়। ফলে আল্লাহ তা'আলা তার হৃদয় খুলে দেন। বহু বিষয় তার সামনে অনবদ্যভাবে আসতে থাকে, শব্দের ফল্গুধারা প্রবাহিত হতে থাকে। যেমনটা ইমাম জাহেয রা: বলেছেন।

২। যথাসম্ভব বক্তৃতা সংক্ষিপ্ত করা। কারণ মানুষ অধিক কথায় বিরক্তি বোধ করে।

ইমাম মুসলিম রহ: ওয়াসিল ইবনে হাইয়ান থেকে বর্ণনা করেন:

> আম্মার আমাদের সামনে ভাষণ দিলেন। তিনি খুব সংক্ষিপ্ত ও তাৎপর্যপূর্ণ ভাষণ দিলেন। তিনি যখন নামলেন, তখন আমরা বললাম: হে আবুল ইয়াকযান! আপনি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিয়েছেন। আপনি যদি আরেকটু দীর্ঘ করতেন! তখন তিনি বললেন: আমি রাসূল ﷺকে বলতে শুনেছি:
>
> নিশ্চয়ই কারো নামায দীর্ঘ হওয়া আর বক্তৃতা সংক্ষিপ্ত হওয়া তার বুদ্ধিমত্তার প্রমাণ। তাই তোমরা নামায দীর্ঘ কর আর বক্তৃতা সংক্ষিপ্ত কর। নিশ্চয়ই কিছু বক্তৃতা যাদু।

৩। এমন রহস্যময় বিষয়াবলী পরিহার করা, যা মানুষ বুঝে না। আলী রা: বলেন:

> মানুষ যে সকল বিষয় বুঝবে, এমন বিষয়ই তাদের নিকট বর্ণনা করো। তোমরা কি চাও, আল্লাহ ও তার রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হোক? (বর্ণনা করেছেন ইমাম বুখারী রহ:)

ইবনে মাসুদ রা: বলেন:

> তুমি মানুষকে এমন কথা বলবে না, যার পর্যন্ত তাদের জ্ঞান পৌঁছবে না। অন্যথায় এটা তাদের কারো জন্য ফেৎনার কারণ হবে। (বর্ণনা করেছেন ইমাম মুসলিম রহ:)

৪। **উচ্চ** বিবেচনার সাথে শব্দ চয়ন করা। যাতে অর্থের চেয়ে বেশি কোন কথা এসে না যায়, ফলে প্রত্যেকে নিজ খেয়াল খুশি মত তার ব্যাখ্যা করতে পারে।

এখানে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করছি, যা ভাষণের মধ্যে নেতাকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে আদর্শগত ও রাজনৈতিক এবং অপরটি হল সামরিক ও জিহাদী।

প্রথমত: আদর্শগত ও রাজনৈতিক: (দিকনির্দেশনামূলক)

এই ভাষণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বৈশিষ্ট্যটি নেতার মধ্যে থাকবে, তা হচ্ছে, প্রথম যুগের দিকে ফিরা। নবী-রাসূলগণের নিয়ে আসা প্রকৃত তাওহীদকে স্পষ্ট করা, সৃষ্টি, প্রতিপালন, উপাসনা, পূর্ণাঙ্গতার গুণাবলী, পরাক্রম, রাজত্ব, শাসন, আনুগত্য, গাম্ভীর্য, প্রভাব, ভয়, আদেশ, সৃষ্টি ও বান্দাদের উপর কর্তৃত্ব ইত্যাদি বিষয়ে আল্লাহর একত্ব প্রকাশ করার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও হেদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশিদীনের ভাষণের দিকে লক্ষ্য রাখা। যেহেতু বর্তমানে সমস্ত মানব সমাজে শিরক ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে।

নিশ্চয়ই ইসলাম এসেছে রাজা-বাদশাদের প্রভূত্ব এবং মানুষের নীতিকে অকার্যকর করার জন্য, মানুষের জন্য সরল ও সহজ দ্বীন প্রতিষ্ঠা করার জন্য এবং সৃষ্টি, রাজত্ব, প্রভূত্ব, নেতৃত্ব, শাসন, আনুগত্য ও ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্ব বাস্তবায়নের জন্য।

সম্ভবত আমাদের যামানায় সর্বজন পরিচিত শিরকের নমুনা হল: শাসনকর্তৃত্বের শিরক, আনুগত্যের শিরক, বিধান প্রণয়নের শিরক, ইবাদতের শিরক ও রাজত্বের শিরক।

নেতাকে তার উত্তম ভাষণের মাধ্যমে এই আদর্শগত বিষয়টি স্পষ্ট করতে হবে। কারণ উম্মাহর মাঝে পরস্পরাগতভাবে এমন কতিপয় ধারণা চলে এসেছে, যেগুলোকে তারা স্থিরনীতি মনে করছে। ফলে এই ধারণা তাদেরকে অনেক দ্বীনী ও দুনিয়াবী কল্যাণের পথে এগুতে বাঁধা দিচ্ছে।

তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য একটি ধারণা হল: "শাসকের জন্য উম্মাহর কল্যাণ-অকল্যাণের বিষয়ে ব্যাপক কর্তৃত্ব চর্চার অধিকার রয়েছে। যদিও তা উম্মাহর দ্বীনী বিষয়েই হোক না কেন"।

শুধু এ বিষয়টির ব্যাপারে বিশেষ করে একটি শরয়ী মূলনীতি রয়েছে, তা হচ্ছে: "মানুষের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য হল মানুষ স্বাধীন"। আর ইসলামে মানুষের রাজনৈতিক স্বাধীনাত নিশ্চিত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আরেকটি দাবি করা হয়, তা হচ্ছে: "উম্মাহর অধিকার রয়েছে শাসককে জবাবদিহিতার সম্মুখীন করা"।

এটা নববী রাজনৈতিক ভাষণেরও একটি অন্যতম মূলনীতি। যেমন বাইআতের চুক্তির মধ্যে থাকে: "আমরা যেখানেই থাকি, হকের সাথে থাকবো আর আল্লাহর ব্যাপারে ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনা ভয় করবো না"। সুতরাং উম্মাহই নেতাদের জবাবদিহিতাকারী। তাই নেতার আনুগত্য নি:শর্ত নয় বা তার সত্তার জন্যও নয়; বরং নেতা নিয়োগের উদ্দেশ্য হচ্ছে ইনসাফ ও ন্যায়বিচার বাস্তবায়ন করা।

আর নেতার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হল, শরীয়তের মূলনীতি ও বিবেচ্য নীতিমালার আলোকে সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য কাজ করা। এসকল মূলনীতি এখানে উল্লেখ করার সুযোগ নেই। তবে যেমনটা পূর্বেও বলেছি, নেতার অবশ্যই এ ব্যাপারে বুৎপত্তি থাকতে হবে, অত:পর তিনি স্বীয় ভাষণে এগুলো তুলে ধরবেন।

দ্বিতীয়: জিহাদী বা সামরিক ভাষণ:

এই ভাষণে শাসক লক্ষ্য রাখবেন, জিহাদের মূল লক্ষ্যের প্রতি, তা যেন শুধু পারস্পরিক লড়াইয়ের জন্য, গনিমত অর্জনের জন্য, নারী বন্দী লাভের জন্য বা অনেক মানুষকে গোলাম বানানোর জন্য না হয়; বরং জিহাদ হবে বান্দাদেরকে বান্দাদের রবের বান্দায় পরিণত করার জন্য এবং তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে অর্থাৎ শিরক ও কুফরের অন্ধকার থেকে তাওহীদের আলোর দিকে নিয়ে আসার জন্য।

তাকে তার উক্ত ভাষণে জিহাদের উদ্দেশ্যাবলী স্পষ্টভাবে বর্ণনা করতে হবে। আর তা হল: দেশ ও জনগণের উপর সীমালঙ্ঘন প্রতিহত করা, পৃথিবীর অসহায়দের সাহায্যের জন্য লড়াই করা, সম্পূর্ণ দ্বীন শুধু আল্লাহর জন্য হওয়ার জন্য যুদ্ধ করা।

তাকে তার ভাষণে একথাও অন্তর্ভূক্ত রাখতে হবে যে, জিহাদের মধ্যে যদিও জানের কষ্ট এবং মাল বিসর্জন দিতে হয়, যা মানবীয় স্বভাববশত: মন অপছন্দ করে, তথাপি তাতে যে সামগ্রীক লাভ ও মানব সমাজ টিকে থাকার অত্যাবশ্যকীয় উপাদানসমূহ রয়েছে, তার কারণে তার পুরোটাই কল্যাণকর। আর কোন যুগেই মানব সমাজ এমন সব দ্বীনের শত্রু ও অপরাধের প্রধানদের থেকে মুক্ত ছিল না, যারা জনগণকে নির্যাতন করে, শাস্তি দেয়, বিপদাপদের সম্মুখীন করে।

আর শাসককে তার এই দৃষ্টিভঙ্গি কার্যত: বাস্তাবায়ন করতে হবে। তাই তিনি থাকবেন মুজাহিদদের সারিসমূহের অগ্রভাগে। আর এটা ব্যাপকভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামের আমল হিসাবেও বর্ণিত।

প্রজা ও সৈন্যদের অন্তরে এই ভাষণের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। তাই এটা গুরুত্বের শীর্ষে। বিশেষ করে শত্রুর সঙ্গে মুখোমুখী যুদ্ধের সময়।

উদাহরণ স্বরূপ:

> মূতার যুদ্ধে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রা: এর ভাষণের কথা স্মরণ করুন। মুসলামান ছিল তিন হাজার। আর তাদের নিকট সংবাদ পৌছলো, হিরাক্লিয়াস এক লক্ষ সৈন্য নিয়ে যুদ্ধে নেমেছে, আর তার সাথে আরব খৃষ্টানদেরও পঞ্চাশ হাজার যুক্ত হয়েছে।
>
> তখন কিছু সংখ্যক মুসলিম বলল: আমরা শত্রুর সংখ্যার ব্যাপারে অবগত করে রাসূলুল্লাহ ﷺকে পত্র লিখি। তারপর তিনি আমাদেরকে যেটা আদেশ করেন, আমরা সেটাই করবো। তখন আব্দুল্লাহ রাওয়াহা রা: ভাষণ দিতে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন: "হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর শপথ! তোমরা যেটার অন্বেষায় বের হয়েছো, সেটাকে অপছন্দ করছো। নিশ্চয়ই তা হল শাহাদাহ। আমরা তো সংখ্যা, শক্তি বা আধিক্যের বলে যুদ্ধ করি না।
>
> আমরা তো এই দ্বীনের বলে যুদ্ধ করি, যার দ্বারা আল্লাহ আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন। তাই তোমরা চলতে থাক। পরিণাম তো দু'টি কল্যাণের যেকোন একটিই। হয়ত বিজয় নয়ত শাহাদাহ"।
>
> তখন সকলে বলে উঠল, আল্লাহর শপথ! ইবনে রাওয়াহা সত্য বলেছে। (তারিখে তাবারী)

নিশ্চয়ই নেতৃত্বশূণ্যতাই উম্মাহর শত্রুদেরকে আমাদের শাসকদের পিছনে পড়ার ও তাদের সুনাম নষ্ট করার সুযোগ করে দিয়েছে। যদিও ঐ সমস্ত শাসকরাও তাদের ছোট-বড় বিভিন্ন ভুলের দ্বারা নিজেদের বিরুদ্ধে শত্রুদের জন্য দলিল করে দিয়েছে, যার ফলে তারা তাদের সুনাম নষ্ট করতে পারছে এবং তাদেরকে সন্ত্রাসী বলে আখ্যা দিতে পেরেছে।

সেসব এখানে সেসব আলোচনা করার অবকাশ নেই। তাদের হত্যা ও গ্রেপ্তারই অনেক অজ্ঞ লোকদেরকে মুজাহিদদের কাতাসমূহে ঢুকে জিহাদকে তার সেই প্রকৃত অর্থ থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে, যা দিয়ে মুহাম্মাদ ﷺ কে প্রেরণ করা হয়েছে। আমি একাধিক স্থানে এ কথাটি উল্লেখ করেছি।

সপ্তম গুণ: الشجاعة (বীরত্ব)

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

"হে মুমিনগণ! যখন তোমরা হানাদার কাফেরদেও মুখোমুখী হও, তখন তাদেরকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করো না। যে ব্যক্তি সেদিন তাদেরকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে যুদ্ধেও জন্য কৌশল অবলম্বন অথবা নিজ দলে স্থান গ্রহণের উদ্দেশ্য ছাড়া, সে আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্রোধ নিয়ে ফিরবে এবং তার ঠিকানা জাহান্নাম। আর অতি মন্দ ঠিকানা।" (আনফাল:১৫,১৬)

অন্য স্থানে বলেন:

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا

"যারা ঈমান এনেছে, তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে। আর যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তারা যুদ্ধ করে তাগুতের পথে। সুতরাং হে মুসলিমগণ! তোমরা শয়তানের বন্ধুদের সঙ্গে যুদ্ধ কর। স্মরণ রেখ, শয়তানের কৌশল অতি দুর্বল।" (সুরা নিসা, ৪:৭৬)

'বীরত্ব' এর অভিধানিক অর্থ: শক্তি, দু:সাহসিকতা, যুদ্ধে দৃঢ়চিত্ততা, স্থির চিত্ততা।

পরিভাষায় 'বীরত্ব' হল: ক্রোধ মিশ্রিত শক্তির এমন একটি অবস্থা, যা দায়িত্বজ্ঞানহীন আবেগ ও কাপুরুষতার মাঝামাঝি, যার দ্বারা ঐ সকল পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা যায়, যেগুলো গ্রহণ করা উচিত।

'বীরত্ব' এমন একটি স্বভাব বা বৈশিষ্ট্য, যা গভীর ঈমান ও দৃঢ় বিশ্বাসের দ্বারা শক্তিশালী হয়। এদু'টি জিনিস তাকে তার সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে দেয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

"যারা আল্লাহকে ভয় করত, তাদের মধ্যে দু'জন লোক, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছিলেন, বলল, তোমরা তাদের উপর চড়াও হয়ে নগরের দরজা দিয়ে প্রবেশ কর। তোমরা যখন তাতে প্রবেশ করবে, তখন তোমরাই বিজয়ী হবে। আল্লাহ তা'আলার উপরই ভরসা রেখ, যদি তোমরা প্রকৃত মুমিন হও।" (সুরা মায়িদা:২৩)

আমরা আয়াতটিতে গভীরভাবে চিন্তা করলে তার পরতে পরতে এ বিষয়টি লক্ষ্য করতে পারবো।

একজন মুসলিম নেতার মাঝে যে সকল বৈশিষ্ট্যগুলোর আবশ্যকীয় সমন্বয় ঘটতে হবে, তার মধ্যে একটি হচ্ছে বীরত্ব।

আমরা যদি নেতার মধ্যে কাঙ্খিত বীরত্বের তাৎপর্যগুলো সম্বন্ধে চিন্তা করতে চাই, তাহলে আমরা পাই, এর অনেকগুলো চমৎকার অর্থ রয়েছে, যা চিন্তা করার মত, বরং তা দ্বারা স্বাদ গ্রহণ করার মত। বীরত্ব হল যুদ্ধ-লড়াইয়ে এগিয়ে যাওয়া। হকের ব্যাপারে দু:সাহসী হওয়া। এমন দৃঢ়তা, যার ফলে ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনার পরওয়া করা হয় না।

তবে এ সব হবে দু'টি মূলনীতির অধীনে:

এক: তা হবে আল্লাহ তা'আলার পথে।

দুই: ইলমের সীমা দ্বারা তার সীমা নির্ধারিত থাকবে।

এই দ্বিতীয় মূলনীতির প্রতি খুব গুরুত্ব দেওয়া আবশ্যক। কারণ বর্তমানে অন্যায়ভাবে রক্তপাতের যে দ:সাহসিকতা চলছে, যা কারো নিকটই অস্পষ্ট নয়, তা জিহাদ, মুজাহিদ ও খেলাফতে রাশেদার জন্য মেহনতকারীদেরও দুর্ণাম করে ফেলেছে। ঐ সকল অজ্ঞরা তাদের জানা অজানা সব ভাবে ইসলামের দুর্ণাম করেছে।

এখানে আরেকটি বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত দেওয়া প্রয়োজন: তা হচ্ছে বীরত্ব সব সময় শুধু কঠোরতার মধ্যেই নয়, যা সর্বাগ্রে সবার চিন্তায় চলে আসে। তাই অন্যায়কারীকে ক্ষমা করে দেওয়াও একপ্রকার বীরত্ব, চাই উক্ত অন্যায়কারী অমুসলিম শত্রু হোক বা অন্য কেউ হোক- যদি তা উপযুক্ত ক্ষেত্রে হয়। বরং এতে আল্লাহ সঙ্গী হন এবং তার সাহায্য ও সন্তুষ্টি সাথে থাকে।

আমরা এর একটি উদাহরণ গ্রহণ করি: জনৈক মুসলিম আমীর। কোনো এক যুদ্ধে আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৈন্যদেরকে এমন একজন লোককে বন্দী করার সুযোগ করে দিলেন, যার স্বীয় কওমের মাঝে উচ্চ অবস্থান ছিল। উক্ত শত্রুর বিষয়টি তার পর্যন্ত অতিক্রম করল। তখন শত্রুটি আমীরের নিকট ক্ষমার আবেদন করতে লাগল এবং মুক্ত হলে তার বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য না করার প্রতিশ্রুতি দিল... ... ।

এখন যদি আমাদের যামানার কোন অজ্ঞ এরকম একটি অবস্থার কথা চিন্তা করে, তাহলে সে গাদ্দারীর অজুহাতে ক্ষমা ও মুক্ত করে দেওয়ার বিষয়টিকে অস্বাভাবিক মনে করবে।

আপনাদেকে আল্লাহর শপথ দিয়ে বলছি: বলুন তো, আপনাদের দৃষ্টিতে কে অধিক বাহাদুর ও দৃঢ়?!

নিশ্চয়ই সে ব্যক্তিই, যার বীরত্বের সাথে দয়াও মিশ্রিত আছে, শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সময়ও তিনি যেটাকে ভুলে যায়নি। সুতরাং তিনি মানুষের বিরুদ্ধে লড়াই করার সেই মূল লক্ষ্যকে ভুলে যাননি, যার কারণে আল্লাহ তার রাসূলকে প্রেরণ করেছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তার পরবর্তী সাহাবায়ে কেরামের আদর্শ এবং দ্বীনের ব্যাপারে পরিপূর্ণ বুঝ ও ইলমের সাথে ছিলেন।

হ্যাঁ, শুধু একারণেই তিনি তার আবেদন গ্রহণ করেছিলেন আর সচরাচর যে গাদ্দারীর আশংকা মনে চলে আসে, সেটাকে দূর করেছিলেন। আর এটা শুধু আল্লাহর পথে বিনিময় প্রাপ্তির আশা, আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ আস্থা এবং তার সাহয্যের কারণেই সম্ভব হয়েছিল।

বরং এক্ষেত্রে যদি শত্রু প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাসঘাতকতা করার নিয়তও করে, তথাপি আল্লাহ তাকে সাহায্য করবেন, যদি তার মাঝে এসকল বিষয়গুলো পাওয়া যায়, তথা পরিপূর্ণ দ্বীন বুঝে করে, এর দ্বারা শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে এবং ইসলামকে সুন্দর আকৃতিতে ফুটিয়ে তোলে।

তখন সে পরিপূর্ণভাবে বুঝতে পারবে যে, আল্লাহই একমাত্র কর্তা, তিনিই সব পরিচালনাকারী, তিনিই সাহায্যকারী, তিনি শত্রুদেরকে দেখেন এবং তাদেরকে পরিবেষ্টন করে আছেন। তিনিই তাকে আদেশ করেছেন মহান লক্ষ্য অর্জনের জন্য নির্ধারিত পথে চলতে, অত:পর তার উপরই ভরসা করতে। তাই অবশ্যম্ভাবীরূপে তিনিই তার সাহায্যকারী।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ

"তারা যদি তোমাকে ধোঁকা দিতে চায়, তবে আল্লাহই তোমার জন্য যথেষ্ট। তিনিই তোমাকে শক্তিশালী করেছেন নিজ সাহায্যে এবং মুমিনদের দ্বারা।" (আনফাল:৬২)

তাহলে আপনাদের দৃষ্টিতে কি এই ব্যক্তি বড় বীর, মহান, প্রিয় ও সম্মানযোগ্য? নাকি যে নেতা ধারণার ভিত্তিতে চলে? সতর্কতা ও সচেতনতার দোহাই দিয়ে মানুষদেরকে হত্যা করে? অথচ সে জানে না যে, ধারণার ভিত্তিতে বিধান কার্যকর করা যায় না। এত সতর্ক হলে সে কেন তার অন্তর ফেড়ে দেখে না যে, সে সত্য বলেছে, না গাদ্দারির নিয়ত করেছে?

সে কি তার এই হত্যার দ্বারা দয়াবান রাসূল ﷺ এর আদর্শের বিরোধিতা, ইসলামের রূপ বিকৃত করা এবং মানুষকে ইসলাম সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ করা ছাড়া কোন ফলাফল বয়ে আনতে পারবে? আল্লাহর শপথ! আমি এটাকে তার ঈমানের দুর্বলতা এবং তাওয়াক্কুল, বিশ্বাস ও আল্লাহর সাথে সম্পর্কের ঘাটতি ছাড়া কিছুই মনে করি না।

এজন্যই প্রিয় ভাইয়েরা! আমি এ ব্যাপারে অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকি যে, আপনারা এমন একজন নেতা মনোনীত করবেন, যিনি এসকল গুণগুলোতে গুণান্বিত হবেন। যাতে আপনারা নিজেদের অজান্তেই আপনাদের দ্বীনকে ধ্বংস করে না ফেলেন।

আমি আপনাদেরকে আরও বলি যে, আপনাদের বন্ধুত্ব হবে আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের জন্য; কোন ব্যক্তি বা নামের জন্য নয়। আপনারা বিভিন্ন প্রতীক দেখে বিভ্রান্ত হবেন না। যতক্ষণ পর্যন্ত এমন একজন নেতার আবির্ভাব না হয়, যার সততা ও সুন্নাহ অনুসরণের ব্যাপারে আপনারা সন্তুষ্ট থাকবেন। ততক্ষণ পর্যন্ত সবর করুন।

অতি উদ্দীপনা ও মুসলমানদের উপর আপতিত বিপদেও ঘনঘটা যেন আপনাদেরকে এমন যে কারুর সাথে যুক্ত হতে প্ররোচিত না করে, যে দ্বীনের প্রতিক উত্তোলন করেছে, অথচ দ্বীন তার থেকে মুক্ত। আপনাদের দ্বীন বুঝুন। নিজেদেরকে ফিৎনায় নিপতিত করবেন না। দ্বীনের সাহায্য করছেন, এই ধারণায় দ্বীনের ক্ষতি করবেন না।

আর আমি নেতৃবৃন্দের উদ্দেশ্যে বলবো:

আমাদের দ্বীনের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করুন, আপনাদের আদর্শ হোক আল্লাহর রাসূল ﷺ, যিনি কোমলতাকে ভালবাসতেন। যেমন আমাদের মাতা আয়েশা রা: বলেছেন:

> যখনই রাসূল ﷺ কে দু'টি বিষয়ের একটি গ্রহণ করার স্বাধীনতা দেওয়া হত, তখন রাসূল ﷺ দু'টির মধ্যে তুলনামূলক সহজটি গ্রহণ করতেন, যতক্ষণ না তা গুনাহ হত। আর যদি গুনাহ হত, তখন তিনিই তার থেকে সর্বাধিক দূরে থাকতেন। (বর্ণনা করেছেন ইমাম বুখারী ও মুসলিম রহ:)

আয়েশা রা: আরও বলেন:

> রাসূল ﷺ কখনো নিজ হাতে কাউকে প্রহার করেননি। কোন স্ত্রীকেও নয়; কোন খাদেমকেও নয়। তবে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে বের হলে ভিন্ন কথা। কখনো তাকে কোন কষ্ট দেওয়ার কারণে তিনি কষ্ট দানকারী থেকে তার প্রতিশোধ নেননি। তবে আল্লাহর কোন বিধানের অমর্যাদা করা হলে তিনি মহান আল্লাহর জন্য তার প্রতিশোধ নিতেন। (বর্ণনা করেছেন ইমাম মুসলিম রহঃ)

সুতরাং আমাদের নবী ﷺ যেখানে বীরত্ব দেখানো উচিত, সেখানে কঠিন বীর ছিলেন আর যে স্থানে বীরত্ব দেখানো আবশ্যক নয়, সেখানে ছিলেন দয়াবান, কোমল ও বিনম্র। তাই শিক্ষা গ্রহণ করুন এবং চিন্তা করুন।

বীরত্বের সীমারেখার ব্যাপারে যা কিছু বলা আবশ্যক মনে হয়েছিল, তা আলোচনা করার পর এখন আমি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বীরত্বের একটি উজ্জল বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করবো, যে বৈশিষ্ট্যর সবচেয়ে বড় ও পূর্ণ অংশটি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মাঝে বিদ্যমান ছিল। আর তা তো থাকবেই, কারণ তিনি হলেন আদম সন্তানের সরদার।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সঙ্গে জিহাদে যখন যুদ্ধের আগুন চরম উত্তপ্ত হত, তখন সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মাধ্যমে আত্মরক্ষা করতেন। তিনি শত্রুর সবচেয়ে নিকটবর্তী থাকতেন। দৃঢ়পদ থাকতেন। নিজ সাথীদেরকে দৃঢ়পদ রাখতেন এবং তাদের সাহস ও উদ্যমতা বাড়িয়ে তুলতেন।

শত্রুর বিশালতা ও সংখ্যাধিক্য তাকে প্রভাবিত করত না। আর তিনি তার সাহাবাদের মাঝেও এই গুণ সৃষ্টি করেন। রাসূল ﷺ এর সকল বীরত্বের ঘটনাগুলো উল্লেখ করতে চাইলে কয়েক খন্ড কিতাবের প্রয়োজন হবে, তাই আমি শুধু উপদেশ গ্রহণের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺএর বীরত্বের ঘটনাবলী থেকে দু'টি ঘটনা বর্ণনা করবোঃ

হযরত আনাস রাঃ বর্ণনা করেনঃ

> এক রাতে মদীনাবাসী ভীষণ ভয় পেল। সকল মানুষ একটি আওয়াযের দিকে ছুটলো। কিন্তু তারা দেখতে পেল, রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখান থেকে ফিরছেন। তিনি সবার আগেই আওয়াযের দিকে চলে গিয়েছিলেন। তিনি আবু তালহা ইবনে আরির ঘোড়ার উপর আরোহী ছিলেন আর তার গর্দানে ছিল তরবারী। তিনি বলছিলেনঃ কোন ভয় নেই, কোন ভয় নেই। (বর্ণনা করেছেন ইমাম বুখারী ও মুসলিম রহঃ)

আবু ইসহাক বর্ণনা করেন, তিনি বলেনঃ আমি বারা'কে শুনেছি,

> জনৈক লোক তাকে জিজ্ঞেস করল, হে আবু ওমায়রা! তোমরা কি হুনায়নের যুদ্ধের দিন পলায়ন করেছিলে? তিনি বললেনঃ না, আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ ﷺ পলায়ন করেননি। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কিছু যুবক ও কম বয়সী সাহাবী খালি হাতে প্রায় নিরস্ত্র অবস্থায় বের হল।
>
> তারা হাওয়াযিন ও বনু নাসর এর একটি তীরন্দায বাহিনীর কাছে এসে পড়ল, যাদের প্রায় একটি তীরও লক্ষ্যভ্রষ্ট হত না। ফলে তারা প্রায় অব্যর্থভাবে তাদেরকে নিশানা বানাতে লাগল।
>
> তখন রাসূল ﷺ সেখানে আসলেন, তিনি তার সাদা খচ্চরে আরোহী ছিলেন। তার চাচাত ভাই আবু সুফিয়ান ইবনে হারেস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব তা টেনে নিচ্ছিল।
>
> তারপর তিনি নীচে নেমে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করলেন এবং এই কবিতা আবৃত্তি করলেনঃ "আমি নবী; মিথ্যাবাদী নই, আমি আব্দুল মুত্তালিবের সন্তান।" তারপর তার সাথীদেরকে কাতারবদ্ধ করলেন। (বর্ণনা করেছেন ইমাম বুখারী রহঃ)

এখানে সেই বীজের কথাও আলোচনা করা আবশ্যক, যে বীজ আমাদের প্রিয় রাসূল ﷺ তাঁর সাহাবা ও উম্মতের আলেমদের মাঝে রোপন করেছেন। প্রথমে শুরু করছি রিবয়ী ইবনে আমের রাঃ কে দিয়েঃ

রিবয়ী ইবনে আমের রাঃ

সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা: রিবয়ী ইবনে আমের রা:কে কাদিসিয়ায় পারস্য সেনাবাহিনীর সেনাপতি ও আমির রুস্তমের নিকট দূত হিসাবে প্রেরণ করেন। তিনি রুস্তরেম দরবারে প্রবেশ করলেন। পারসীরা তার মজলিসকে স্বর্ণখচিত গদি ও রেশমের গালিচা দিয়ে সুসজ্জিত করল।

দামি দামি মণি মুক্তা ও সাজ-সজ্জার প্রদর্শনী আয়োজন করল আর তার মাথায় শোভা পাচ্ছিল রাজ মুকুট। এছাড়াও আরো দামি দামি বস্তুরাজী ছিল। সে তার সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিল।

রিবয়ী ইবনে আমের রা: মোটা কাপড়, ডাল, তরবারী ও শীর্ণকায় অশ্ব নিয়ে প্রবেশ করলেন। তিনি তাতে আরোহী অবস্থায়ই গালিচার উপর দিয়ে চলতে লাগলেন। অত:পর সওয়ারী থেকে অবতরণ করে সিংহাসনের একটি খুটির সাথে তা বাঁধলেন।

তিনি সামনে এগুতে লাগলেন। তার গায়ে যুদ্ধের পোষাক ও অস্ত্র। মাথায় শিরস্ত্রাণ। তারা বলল, অস্ত্র খুলুন। তিনি বললেন, আমি নিজে তোমদের নিকট আসিনি; তোমাদের আহ্বানের কারণে এসেছি। তাই যদি এভাবে আসতে দাও, তাহলে আসতে পারি, অন্যথায় আমি ফিরে যাই।

তখন রুস্তম বলল, তাকে আসতে দাও। তারপর তিনি বর্ষার উপর ভর দিয়ে কার্পেটের গায়ে খোচা দিতে দিতে অগ্রসর হলেন। এভাবে কার্পেটের অধিকাংশটাই ফোড়া করে দিলেন। অত:পর তারা জিজ্ঞেস করল: তোমরা কিজন্য এসেছো?

তিনি বললেন: আল্লাহ আমাদেরকে প্রেরণ করেছেন, যেন আমরা আল্লাহ যাদের চান তাদেরকে বান্দাদের ইবাদত থেকে বের করে আল্লাহর ইবাদতের দিকে, দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে আখিরাতের প্রশস্ততার দিকে এবং বহু ধর্মের জুলুম থেকে ইসলামের ইনসাফের দিকে নিয়ে আসি।

তাই তিনি আমাদেরকে তার দ্বীন দিয়ে তার সৃষ্টির নিকট প্রেরণ করেছেন, যেন আমরা তাদেরকে তার দিকে আহ্বান করি। অত:পর যে তা কবুল করে, আমরা তার থেকে তা গ্রহণ করে ফিরে যাই আর যে অস্বীকার করে তার বিরুদ্ধে সর্বদা যুদ্ধ চালিয়ে যাই। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া লি ইবনে কাসীর)

এটাই হল সেই বীরত্ব, যার ফলে তিনি ক্ষমতা, রাজত্ব ও শক্তিশালী সেনাবাহিনীকে ভয় করেননি। এটা হচ্ছে সত্য বীরত্ব ও শক্তি, যা আল্লাহ প্রদত্ত ও তার সাহায্যপ্রাপ্ত।

আবু বকর রা:

যদিও এই ঘটনাটি পূর্বে 'দৃঢ়তা' পর্বে উল্লেখ করেছি, তথাপি এখানেও পুনরাবৃত্তি করছি। ঘটনাটিতে অনেক উপদেশ ও শিক্ষা রয়েছে। বিভিন্ন দিক থেকে তার দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়।

আবু বকর রা: মুরতাদ ও যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে সংঘটিত যুদ্ধসমূহে আল্লাহর উপর ভরসা করে দৃঢ়তার সঙ্গে দাঁড়িয়েছিলেন। ফলে তিনি ইসলামী রাষ্ট্রের খুটিগুলো দৃঢ় করেন, তাকে সুরক্ষিত করেন এবং তাকে ফাটল ও বিভক্তি থেকে রক্ষা করেন।

এমনকি কিছু মুসলিম তাকে বলেছিল: হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা! সমগ্র আরবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার শক্তি আপনার নেই। আপনি নিজ ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে বসে থাকুন আর মৃত্যু আসার আগ পর্যন্ত আপনার রবের ইবাদতে নিয়োজিত থাকুন। কিন্তু সদা ক্রন্দনকারী, নম্র, মহানুভব ও কোমল হৃদয়ের লোকটি এক মুহূর্তের মধ্যে তেজস্বী সিংহে পরিণত হয়ে গেলেন।

উমার ইবনুল খাত্তাবের ব্যাপারে বজ্র কণ্ঠে বললেন: জাহিলিয়াহের সময় দাপটশালী আর ইসলামের মধ্যে ভীরু হয়ে গেলে? নিশ্চয়ই ওহী পরিপূর্ণ ও শেষ হয়ে গিয়েছে... তাই কিভাবে আমি জীবিত থাকতে দ্বীনের ক্ষতি হতে পারে? আল্লাহর শপথ! তারা রাসূলুল্লাহর যামানায় যে উটের রশির যাকাত দিত, আজ যদি তা থেকেও বিরত থাকে, তাহলে আমি এর জন্যও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো।

মুহাম্মাদ ইবনে আকিল ইবনে আবি তালিব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

> আলী ইবনে আবি তালিব রা: আমাদের মাঝে ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন: হে লোক সকল! আপনারা বলুন তো, মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় বীর কে?
>
> তারা বলল: আমরা জানি না, কে?
>
> তিনি বললেন: আবু বকর সিদ্দীক রা:। আমরা বদর যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জন্য একটি মাচা বানালাম। অত:পর আমরা ঘোষণা দিলাম: কে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে থাকবে, যেন কোন মুশরিক তার কাছে ঘেষতে না পারে। আল্লাহর শপথ! তখন আমদের মধ্য থেকে কেউ তার নিকট এগিয়ে আসেনি; একমাত্র আবু বকর এগিয়ে এসেছিলেন।

তিনি কাউকে আঘাত করেন, কাউকে ঠেকিয়ে দেন এবং কাউকে পাল্টা আক্রমণ করেন। আর তিনি বলতে থাকেন, ধ্বংস তোমাদের জন্য! তোমরা একজন লোককে এই জন্য হত্যা করতে চাচ্ছো যে, সে বলে, আমার রব আল্লাহ। তারপর আলী রা: তার গায়ে থাকা চাদরটি উপরে উঠান। তারপর তিনি কাঁদতে কাঁদতে তার দাড়ি ভিজিয়ে ফেলেন।

তারপর আলী রা: বলেন: আমি আপনাদেরকে আল্লাহর শপথ দিয়ে বলছি: আপনারা বলুন তো, ফেরাউন বংশের সেই মুমিন ব্যক্তি উত্তম, না আবু বকর রা: উত্তম? বর্ণনাকারী বলেন: সবাই চুপ থাকলেন।

তারপর তিনি বললেন: তোমরা কি আমাকে উত্তর দিবে না? আল্লাহর শপথ! আবু বকরের একটি মুহূর্ত ফেরাউন বংশের সেই মুমিনের মত দুনিয়া ভরা লোকের চেয়ে উত্তম। সেই ব্যক্তি তার ঈমান গোপন করত আর তিনি তার ঈমানকে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন। (মুসনাদুল বাযযার)

উমার ফারুক রা:

তিনি ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথেই তার বীরত্ব ও বাহাদুরি প্রকাশ করেন। তার প্রচণ্ড আগ্রহ হল মক্কায় ইসলামকে প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে এবং মুশরিকদের মুখোমুখী হতে। অথচ ইতিপূর্বে মুসলিমগণ মানুষের কাছে যেত গোপনে গোপনে। তিনি বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কেন আমাদের দ্বীনকে গোপন করব, অথচ আমরা হকের উপর আছি, আর তারা হল বাতিল?

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: আমরা সংখ্যায় স্বল্প আর আমরা কি পরিস্থির সম্মুখীন হয়েছি তা তো তুমি দেখেছো। তখন উমার রা: বললেন: সেই প্রভুর শপথ! যিনি আপনাকে সত্য দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যত মজলিসে আমি কুফরী নিয়ে বসেছিলাম, এখন আমি প্রতিটি মজলিসে ঈমান নিয়ে বসব।

তারপর রাসূল ﷺ মুসলমানদেরকে দু'টি কাতারবদ্ধ করে কা'বার দিকে রওয়ানা দিলেন। এক কাতারে হামযা, অন্য কাতারে উমার। (ঘটনাটি আবু নুআইম, ইবনে আসাকির ও ইবনুল জাওযী উল্লেখ করেছেন।)

তিনি যখন হিজরত করার ইচ্ছা করলেন, তখন কুরাইশের একটি সভার মধ্যে ঘোষণা দিলেন: যে তার মাকে সন্তান হারা করতে চায়, নিজ সন্তানকে ইয়াতীম করতে চায়, সে যেন এই উপত্যকার অপর পাশে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। তখন কেউ তার পিছনে যেতে সাহস করেনি।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা: বলেন: যখন থেকে উমার ইসলাম গ্রহণ করল, তখন আমরা সর্বদাই দাপটশালী থেকেছি। (ঘটনাটি ইবনে আসাকির ও ইবনুল আছির উল্লেখ করেছেন।)

-যুন্নুরাইন উসমান ইবনে আফ্ফান রা:

উসমান রা: কে সাহাবাদের মধ্যে সবচেয়ে বাহাদুর হিসাবে গণ্য করা হয়। তিনি সবগুলো যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সঙ্গে উপস্থিত হয়েছেন। মুসলমানদের কোন যুদ্ধ থেকেই পিছিয়ে থাকেননি। একমাত্র বদরের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺএর কণ্যা রুকাইয়া রা: এর পাশে থাকতে বলেন। কারণ তিনি (রুকাইয়া রা:) অসুস্থ ছিলেন।

আমীরুল মুমিনীন উসমান রা: এর চূড়ান্ত বীরত্ব প্রকাশ পায় যে সময় তাকে তার নিজ ঘরে অবরুদ্ধ করা হয়। তিনি দু'চোখের সামনে মৃত্যু দেখতে পাচ্ছিলেন। তিনি জানতেন যে, তিনি একটি মাত্র কথার মাধ্যমে এই মৃত্যুকে প্রতিহত করতে পারেন। আর তা হচ্ছে তিনি মুসলিমদের খেলাফত থেকে সরে দাঁড়াবেন।

কিন্তু তিনি এটাকে প্রত্যাখ্যান করেন। অথচ তিনি জানেন, মৃত্যু তার জন্য অপেক্ষা করছে। তার পক্ষ থেকে প্রতিহত করারও কেউ নেই। তার কোন প্রহরী বা গোয়েন্দা বাহিনীও নেই। তিনি এমন একটি বিষয় ছাড়তে অস্বীকার করেন, যেটা আল্লাহর আদেশ নয় অথবা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত কোন বিষয়ও নয়।

তিনি নিজ জীবন ও নিজ খেলাফত বহাল রাখার জন্য বা শুধু মাত্র বেঁচে থাকার জন্য কৌশল অবলম্বন করেননি। তাকে মৃত্যুর পূর্বে মারা হয়েছে, জখম করা হয়েছে, কিন্তু তিনি সামান্যও নমনীয় হননি। একই সময়ে মৃত্যু ও পিপাসা তাকে হাতছানি দিতে থাকে, কিন্তু তিনি নমনীয় হননি। তাকে আকস্মিকও হত্যা করা হয়নি; বরং স্বাধীনতা দেওয় হয়েছে: হয়ত মৃত্যু অথবা খেলাফত ছেড়ে দিতে হবে।

কিন্তু তিনি নিজের থেকে বায়আত তুলে নেননি। কাউকে আহ্বানও করেননি তার পক্ষে লড়াই করার জন্য। শুধু মাত্র মুসলমানদের রক্তের হেফাজতের জন্য তিনি নিজেকে কুরবানী করে দেন। আল্লাহর তার প্রতি সন্তুষ্ট হোন।

-আলী ইবনে আবি তালিব রাঃ

খায়বার যুদ্ধের আলোচনা প্রসঙ্গে সালামা ইবনুল আকওয়া রাঃ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ

খায়বার যুদ্ধে আলী রাঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে ছিলেন না। তার চোখ উঠেছিল। কিন্তু তিনি বললেনঃ আমি কি রাসূলুল্লাহর ﷺ এর পিছনে থেকে যাবো? তাই তিন পরে গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সঙ্গে মিলিত হন।

অত:পর যখন সেই রাত্রি আসল, যে রাত্রির পরবর্তী সকাল বেলা আল্লাহ তা'আলা বিজয় দান করেছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ আমি আগামীকাল এমন এক ব্যক্তিকে পতাকা দিব (বা এমন ব্যক্তি পতাকা হাতে নিবে), যাকে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল ভালবাসেন।

অথবা বলেছিলেনঃ যে আল্লাহ ও তার রাসূলকে ভালবাসে। আল্লাহ তার হাতে বিজয় দান করবেন। তারপর আমরা দেখতে পেলাম 'আলী'। আমরা তাকে ধারণা করেছিলাম না। সবাই বললঃ এই তো আলী। তখন রাসূল ﷺ তার হাতে পতাকা দিলেন।

কাফের পক্ষের মারহাব বের হয়ে বলতে লাগলঃ

- খায়বার জেনে গেছে আমি হলাম মারহাব। সেই সময়ের বাহাদুর, সম্পূর্ণ স্বসস্ত্র ও যুদ্ধাভিজ্ঞ, যখন যুদ্ধের লেলিহান শিখা জ্বলে উঠে।

তখন আলী রাঃ বললেনঃ

- আমি হলাম সেই ব্যক্তি, আমার মা আমার নাম রেখেছে হায়দার (সিংহ)। বনের সিংহের ন্যায়, যা দেখতে অসুন্দর। আমি তাদেরকে 'সানদারার' মাপ বুঝিয়ে দিব।

বর্ণনাকারী বলেনঃ অত:পর আলী রাঃ মারহাবের মাথায় আঘাত করে তাকে হত্যা করে ফেলেন এবং বিজয় তার হাতেই হয়। (বর্ণনা করেছেন ইমাম মুসলিম রহঃ)

-খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রাঃ

সর্বপ্রথম মূতার যুদ্ধেই হযরত খালিদ রাঃ অংশ গ্রহণ করেন। মূতার যুদ্ধের তিন সেনাপতি, যায়দ ইবনে হারেসা, জাফর ইবনে আবি তালিব ও আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা শহীদ হয়ে যান।

তখন সাবিত ইবনে আকরাম রাঃ দৌড়ে এসে পতাকা উচু করে ধরেন। অত:পর খালিদ রাঃ এর দিকে অগ্রসর হয়ে তাকে বলেনঃ হে আবু সুলাইমান! আপনি পাতাকা ধারণ করুন।

খালিদ রাঃ নিজেকে এটা গ্রহণ করার অধিকারী মনে করলেন না। তাই তিনি এই বলে ওযর পেশ করলেনঃ আমি এই পতাকা নিব না, আপনি এর যোগ্যতম অধিকারী। আপনার বয়সও বেশি এবং আপনি বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন।

সাবিত রাঃ তাকে উত্তর দেনঃ আপনি আমার চেয়ে যুদ্ধাভিজ্ঞ। আর আল্লাহর শপথ! আমি এটা আপনার জন্যই গ্রহণ করেছি। অত:পর তিনি মুসলমানদের মাঝে ঘোষণা দিলেনঃ আপনারা কি খালিদের নেতৃত্বে সন্তুষ্ট? সকলে বললঃ হ্যাঁ। তখন খালিদ রাঃ পতাকা হাতে নিয়ে মুসলিমদেরকে উদ্ধার করলেন।

খালিদ রাঃ বলেনঃ মূতার যুদ্ধে আমার হাতে নয়টি তরবারী ভেঙ্গে গেছে। তারপর আমার নিকট আমার ইয়ামানী তরবারীটি ছাড়া কিছু বাকি রইল না। (বর্ণনা করেছেন ইমাম বুখারী রহঃ)

রাসূল ﷺ যখন সাহাবাদেরকে এই যুদ্ধের সংবাদ দিচ্ছিলেন, তখন তিনি বললেনঃ এখন পতাকা হাতে নিয়েছে যায়দ, সে নিহত হয়েছে। তারপর পতাকা হাতে নিয়েছে জাফর, সেও নিহত হয়েছে। তারপর পতাকা হাতে নিয়েছে আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা, সেও নিহত হয়েছে।

সবশেষে তরবারী হাতে নিয়েছে আল্লাহর তরবারীসমূহের মধ্যে একটি তরবারী। আল্লাহ তার হাতে বিজয় দান করেছেন। ঐ দিন থেকে খালিদ রা:কে সাইফুল্লাহ (আল্লাহর তরবারী) বলে নামকরণ করা হয়। (বর্ণনা করেছেন ইমাম বুখারী রহ:)

রিদ্দার যুদ্ধসমূহে হযরত খালিদ রাঃ এর অবদানঃ তিনি মক্কা বিজয় ও রিদ্দার যুদ্ধসমূহে অংশগ্রহণ করেন। বনু তামিম ও অন্যান্য গোত্রসমূহের বিদ্রোহ দমন করেন। মালেক ইবনে নুওয়াইরাকে হত্যা করেন। অত:পর বুযাখাবাসীদের উপর আঘাতত হানেন। এটাই খালিদ ও তুলাইহা ইবনে খুওয়াইলিদের মধ্যকার যুদ্ধ।

তিনি বুযাখাবাসীদের আগুনে পোড়ান। কারণ তাদের ব্যাপারে তার নিকট এই মন্দ সংবাদ পৌছেছিল যে, তারা নবী ﷺকে গালি দান করেছে এবং নিজদের ধর্মত্যাগের উপর বহাল রয়েছে। তারপর ইয়ামামার দিকে অগ্রসর হন এবং মুসাইলামাতুল কায্যাব ও তার সহযোগী বনু হানিফার ঔদ্ধত্যের সমাপ্তি ঘটনা।

এই বাহাদুর সিপাহসালারের কৃতিত্ব স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছিল ইয়ারমুকের যুদ্ধে, যখন আবু বকর রা: মুসলিম সেনাবাহিনীর নেতৃত্বের ভার অর্পণ করেছিলেন খালিদ রাঃ এর হাতে, দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার রোমক বাহিনীর মোকাবেলা করার জন্য।

খালিদ রাঃ মুসলিম সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে দাঁড়ালেন। তিনি বললেনঃ

> নিশ্চয়ই এটি আল্লাহর দিন সমূহ হতে একটি দিন। আজকের দিনে কোন গৌরব বা ঔদ্ধত্য করা শোভনীয় নয়। আপনারা আপনাদের জিহাদের মধ্যে ইখলাস আনয়ন করুন এবং আপনাদের কাজের মাধ্যমে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করুন। আর আসুন, আমরা পালাক্রমে নেতৃত্ব দেই। আজ একজন নেতৃত্ব দিবে, আগামীকাল আরেকজন দিবে, আরেকজন তারপরের দিন নেতৃত্ব দিবে। এভাবে আপনাদের সবাই নেতৃত্ব দিবে।

তার শক্তিশালী ভাষণ ক্ষমতা ছিল। ভাষণের মাধ্যমে নিজ সৈন্যদের মনোবল বাড়িয়ে তুলতেন, উদ্যমতা সৃষ্টি করতেন এবং তাদের অন্তরে দায়িত্বভার বহন করার যোগ্যতা সৃষ্টি করতেন। এই ভাষণের মাঝে তিনি সৈন্যদের মাঝে এই ধারণা দেন যে, নেতৃত্ব পালাক্রমে সকলের কাছেই আসবে।

যেন সকলেই এই ধরণের দায়িত্বের জন্য প্রস্তুত থাকতে পারে। ঠিক এভাবে মুসলিম শিশু ও যুবকদেরকে ছোট থেকে নেতৃত্বের শিক্ষা দেওয়া উচিত। কারণ তারাই আগামী দিনের নেতৃত্ব দানকারী। তারাই ভবিষ্যতে আল্লাহর বিধান বাস্তাবয়ন, তার শরীয়ত প্রতিষ্ঠা ও তার দ্বীন প্রসারের দায়িত্ব পালন করবে।

যুদ্ধ শুরুর পূর্বে রোমের সেনাপতি খালিদ রাঃ কে তার সাথে মল্লযুদ্ধ লড়ার আহ্বান জানাল। খালিদ রাঃ দুই বাহিনীর মধ্যবর্তী খালি জায়গায় তার সঙ্গে মল্লযুদ্ধে লিপ্ত হন। তখন রোমের সেনাপতি মাহান বললঃ

> আমরা জেনেছি, কষ্ট ও ক্ষুধাই তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বের করে নিয়ে এসেছে। তাই তোমরা যদি চাও, তাহলে আমরা তোমাদের প্রত্যেককে দশ দিনার এবং অন্য-বস্ত্র দান করতে করি, তোমরা তোমাদের দেশে ফিরে যাও। আর সামনের বছরও তোমদের জন্য এই পরিমাণ পাঠিয়ে দিব।

খালিদ রাঃ এই রোমীর কথায় অশিষ্ট্যতা লক্ষ্য করলেন। তাই তিনি এই বলে উত্তর দিলেনঃ

> "ক্ষুধা আমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে বের করে নিয়ে আসেনি, যেমনটা তুমি উল্লেখ করলে। বরং আমরা এমন এক সম্প্রদায়, আমরা রক্ত পান করি। আর আমরা জানতে পেরেছি, রোমীয়দের রক্ত থেকে মনোহর ও উৎকৃষ্টমানের রক্ত আর কারো নেই। তাই আমরা রক্তপানের এসেছি"। নিশ্চয়ই এই উত্তরটি এই সিপাহসালারের অসাধারণ ক্ষিপ্রতা এবং কাফেরদের উপর বীরত্ব ও বাহাদুরীর সাক্ষ্য দেয়।
>
> তিনি তাদের সংখ্যাধিক্যের পরওয়া করেননি। বরং তার দৃঢ় কঠিন উত্তরের মাধ্যমে তাদেরই অটুট মনোবল নড়বড়ে করে দিয়েছেন।

তারপর তিনি তার অশ্ব নিয়ে মূল বাহিনীর সাথে এসে মিলিত হন এবং পতাকা উচু করে আল্লাহু আকবার বলে যুদ্ধের ঘোষণা দেন।

বয়ে যাও হে জান্নাতের বাতাস! আর এই অসাধারণ নেতৃত্ব, অসীম দৃঢ়তা ও প্রজ্ঞাবান নেতার বীরত্বের কারণেই আল্লাহর অনুগ্রহে বিজয় লাভ হয়েছিল।

অনুরূপ যখন আবু বকর রাঃ এর ওফাতের সংবাদ পৌছল এবং তারপর উমার রাঃখেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করে খালিদ রাঃ পরিবর্তে আবু উবায়দা ইবনুল জার্‌রাহ রাঃ কে সেনাবাহিনীর দায়িত্ব প্রদান করলেন, তখন আরেকবার খালিদ রাঃএর বীরত্ব স্পষ্টভাবে ফুটে উঠে। তিনি বিজয়ী হওয়া সত্ত্বেও নেতৃত্ব থেকে সরে দাঁড়ালেন। নিজের ব্যাপারে এই আত্মপ্রবঞ্চনায় লিপ্ত হলেন না যে, আমি তো বিজয় এনেছি, আমিই তো নেতৃত্বের অধিক যোগ্য।

বরং তিনি সন্তুষ্টচিত্তে সরে পড়লেন। কারণ তিনি একমাত্র আল্লাহর জন্যই যুদ্ধ করছিলেন। এছাড়া অন্য কোন দুনিয়াবী বিষয়াদীর প্রত্যাশা তার ছিল না। তিনি যুদ্ধ করতেন, যেন এক আল্লাহর ইবাদত প্রতিষ্ঠিত হয়, তার শরীয়তের শাসন বাস্তবয়িত হয়।

এটাই ঐ সকল নেতাদের বৈশিষ্ট্য, যারা তাদের আমিরদের আদেশ নিষেধ মনে প্রাণে মেনে চলতেন এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির মধ্যে তাদের আনুগত্য করতেন। কিন্তু বর্তমানে আফসোসের বিষয় হচ্ছে, আমরা অনেক মানুষ পাই, যারা সালাফের পদাঙ্কের উপর থাকার দাবি করে, অথচ আমিরের অবাধ্যতা করে, মুসলমানদের দলে বিভক্তি সৃষ্টি করে। শুধু তাই নয়; নেতৃত্বের লোভে উম্মাহর মাঝে বিভিন্ন ক্ষুদ্র দল সৃষ্টি করা ও মুসলিম জামাতকে বিভক্ত করার দিকে আহ্বান করে। একথা ভুলে যায় যে, এটা কিয়ামতের দিন অনুতাপ ও অনুশোচনার কারণ হবে।

নিশ্চয়ই খালিদ রাঃ এর বীরত্ব ছিল ইতিহাসের বিরল নমুনা। বর্তমান বিশ্বও তাদের সমরনীতিতে তার সমরকৌশলসমূহ থেকে পাঠ গ্রহণ করে।

বালক সাহাবীগণ ও আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাঃ

আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাঃ বলেনঃ বদর যুদ্ধের দিন আমি যুদ্ধের সারিতে। আমি আমার ডানে ও বামে তাকিয়ে দেখি, স্বল্প বয়স্ক দু'জন বালক। আমার পাশে তাদের অবস্থানের কারণে আমি যেন অনিরাপত্তাবোধ করছিলাম।

ইত্যবসরে তাদের একজন অপরজন থেকে লুকিয়ে আমাকে বললঃ চাচা! আমাকে আবু জাহেলকে দেখিয়ে দিন। আমি বললাম, ভাতিজা! তুমি তাকে দিয়ে কি করবে?

সে বললঃ

আমি আল্লাহর সাথে শপথ করেছি, আমি যদি তাকে দেখতে পাই, তাহলে হয়ত তাকে হত্যা করবো অথবা আমি নিহত হবো। তারপর তার অপর সাথীও তার থেকে লুকিয়ে আমাকে অনুরূপ কথাই বলল। তখন আমার নিকট মনে হল, তাদের স্থানে দু'জন পুরুষ থাকলেও আমি এতটা খুশি হতাম না।

আমি তাদেরকে আবু জাহেলকে দেখিয়ে দিলাম। তৎক্ষণাৎ তারা বাজপাখির মত তার উপর ঝাপিয়ে পড়ল এবং তাকে আঘাত করে হত্যা করে ফেলল। তারা ছিল আফরা এর দুই ছেলে। (বর্ণনা করেছেন ইমাম বুখারী রহঃ)

আমাদেরও উচিত, আমাদের সন্তানদেরকে এভাবে প্রতিপালিত করা। আমরা তাদের আত্মমর্যাদাবোধ জাগিয়ে তুলবো নিজেদের দ্বীনের জন্য, তাদের নবীর জন্য এবং মুমিনদের জন্য। তাদের হৃদয়ে আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য ভালাবাসার বীজ বপন করবো।

আল্লাহ তা'আলা এই প্রস্তুতি গ্রহণের ব্যাপারেই নিম্নোক্ত আয়াতে আমাদেরকে আদেশ করেছেন-

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ

"তোমরা তাদের (বিরুদ্ধে যুদ্ধের) জন্য তোমাদের সামর্থ্যমত শক্তি প্রস্তুত কর।"

এই আয়াতে 'শক্তি' মানে হচ্ছে নিক্ষেপ করা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তার এরূপ তাফসীরই করেছেন। যেমন ইমাম মুসলিম রহঃ উকবা ইবনে আমের রাঃ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছেন,

তিনি তখন মিম্বারে ছিলেন, তিনি বলছিলেনঃ

"তোমরা তাদের জন্য তোমাদের সাধ্যমত শক্তি প্রস্তুত কর"- জেনে রেখ, শক্তি হচ্ছে নিক্ষেপ করা। জেনে রেখ, শক্তি হচ্ছে নিক্ষেপ করা। জেনে রেখ, শক্তি হচ্ছে নিক্ষেপ করা।"

তবে রাসূল ﷺ এর এ কথা দ্বারা আয়াতে বর্ণিত যেকোন প্রকার শক্তিকে বিশেষ প্রকারের সাথে শর্তযুক্ত করা বুঝা যায় না। বরং হাদিসের অর্থ হচ্ছে: নিক্ষেপ করা হল এ সকল শক্তিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও বড়। আর সে সময়ের ধনুকের সাহায্যে তীর নিক্ষেপের হুকুমটি বর্তমানে প্রযোজ্য হবে বিভিন্ন আধুনিক যুদ্ধাস্ত্রের সাহায্যে নিক্ষেপ করার উপর।

যেগুলোর জন্য সাধারণত: দীর্ঘ নিয়মতান্ত্রিক চেষ্টা ও পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়। যা অনিবার্যভাবে ব্যাপক আকাড়ে প্রস্তুতি গ্রহণকে দাবি করে। যেমনিভাবে ধনুকের সাহায্যে তীর নিক্ষেপের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হত। বর্তমানে আমরা এর খোঁজেই আছি এবং এটাই আমাদের সবচেয়ে বেশি পায়োজন।

কারণ উম্মাহ তাদের বর্তমান দুর্দশা থেকে ততক্ষণ পর্যন্ত কিছুতেই উত্তরণের পথ পাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নবী ﷺ ও তার সাহাবাদের পথে ফিরে না আসবে।

আর সাহাবায়ে কেরামের এই ভূমিকা একমাত্র রাসূলুল্লাহ ﷺএর উন্নত দীক্ষার কারণেই হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা তাদের মাধ্যমে দ্বীনকে হেফাজত করেছেন এবং অসংখ্য দেশ বিজিত করেছেন।

কতক উলামায়ে কেরামের ভূমিকা:

উম্মাহর ইতিহাস এমন অসংখ্য বীর উলামায়ে কেরামের দ্বারা পরিপূর্ণ, যারা বাতিলের ব্যাপারে নিরব থাকার উপর সন্তুষ্ট থাকতে পারেননি। তাই তারা এমন অজস্র অবদান রেখেছেন, যে অবদানগুলো আজ আমাদের প্রয়োজন। বাতিলকে ধ্বংস করার জন্য, হককে মানুষের সামনে প্রকাশ করার জন্য এবং মানুষকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে আসার জন্য।

সেই অন্ধকার, যুগের তাগুত স্বৈরাচারী শাসকরা যে অন্ধকারে মানুষকে নিমজ্জিত করেছে, যে অন্ধকার ঘোর অমানিষার রজনীতে সাগরের অন্ধকার থেকেও ভয়ংকর। তারা তাদেরকে সেই নূর থেকে মুক্ত করে ফেলেছে, যে নূর নিয়ে মুহাম্মদ ﷺ পৃথিবীতে এসেছেন।

আমরা এসকল উলমায়ে কেরাম থেকে কয়েকজনের আলোচনা করছি:

আহমাদ ইবনে হাম্বল রহঃ

তাকে নির্যাতন করা হয়, কারারুদ্ধ করা হয়, যেটাকে ইতিহাসে খলকে কুরআনের ফিৎনা বলে অভিহিত করা হয়। কিন্তু তিনি আপন অবস্থানে অটল থাকেন। তার থেকে সামান্যও নড়েননি। বাতিলের মুকাবেলায় তার বীরত্ব ও দৃঢ়তার কারণে উম্মাহর উপর আজও তার মহান অনুগ্রহ রয়ে গেছে। ফলে উম্মাহ আজও বিশুদ্ধ আকীদার উপর অটল আছে। আল্লাহ তাকে আমাদের পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহঃ

কতিপয় মাসআলায় নিজস্ব ইজতিহাদের কারণে তিনি তার সমকালীন ফকীহদের বিরোধিতায় পতিত হন। ফলে তারা সুলতানের নিকট তার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করলে সুলতান তাকে কারারুদ্ধ করে। তিনি কারাগারে বসেই স্বীয় মাযহাবের সমর্থনে এবং প্রতিপক্ষের দলিল খন্ডন করে অসংখ্য পুস্তিকা লিখতে থাকেন।

ইজ্জুদ্দীন ইবনে আব্দুস সালাম রহঃ

তার সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ঘটনা, যার কারণে বাদশা আইয়ুবের সাথে তার সংঘাত হয়েছিল, তা হচ্ছে: তিনি যখন মিশরে বসবাস করছিলেন, তখন প্রকাশ পেল যে, দেশের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব ও বড় বড় পদের ব্যক্তিরা সকলেই গোলাম। পূর্বে মালিক নাজমুদ্দীন আয়্যুব তাদেরকে ক্রয় করেছিল।

একারণে তাদের উপর গোলাম বা দাসের বিধান কার্যকর হবে। স্বাধীনদের উপর তাদের নেতৃত্ব বৈধ নয়। তাই তিনি স্পষ্টভাবে তার ফাতওয়া প্রকাশ করেন যে, তাদের নেতৃত্ব জায়েয হবে না; কারণ তারা গোলাম। সমগ্র মিশর সেই সকল আমিরদের ক্রোধে জ্বলে উঠল, যারা প্রতিটি উচু উচু পদে সমাসীন ছিল।

এমনকি সরাসরি সুলতানের নায়েবও দাসদের অন্তর্ভূক্ত ছিল। তারা শায়খ ইজ্জুদ্দীন ইবনে আব্দুস সালামের নিকট আসল। তারা তাকে এই ফাতওয়া থেকে বিরত করার চেষ্টা করল। তারপর তাকে হুমকি ধমকি দিল। কিন্তু তিনি এসকল হুমকি ধমকি প্রত্যাখ্যান করলেন।

অথচ তিনি দামেশক থেকে ভীষণ নিপীড়ন সহ্য করে এখানে মিশরে এসেছিলেন। কিন্তু তিনি তার জীবনে হক কালিমার বিকল্প কিছু খুজে পাননি।

তাই বিষয়টি মালিক আয়্যুবের নিকট উত্থাপন করা হয়। বাদশা শায়খের কথাকে অসম্ভব মনে করে তা প্রত্যাখ্যান করল। আর বলে দিল, এ ব্যাপারে কথা বললে তা ক্ষমাযোগ্য হবে না। তাই শায়খ বুঝতে পারলেন যে, তার কথা শোনা হবে না। এজন্য তিনি বিচারকের পদ থেকে পদত্যাগ করেন।

তিনি শুধু ফাতওয়া প্রদানকারী হয়ে বসে থাকলেন না; কারণ তিনি জানেন যে, যেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা তাকে তার কথা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন, তেমনিভাবে তার নিরবতা সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করবেন। এখানে শায়খ ইজ্জুদ্দীন ইবনে আব্দুস সালামের বীরত্ব প্রকাশ পায়।

অত:পর এই আল্লাহভীরু আলেম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, তিনি সকল সামাজিক অবস্থান, সম্পদ, নিরাপত্তা, বরং পুরো দুনিয়াকে কুরবানী করে উচু পদ থেকে সরে পড়বেন। শায়খ ইজ্জুদ্দীন ইবনে আব্দুস সালাম তার গাধায় আরোহন করলেন এবং তার পরিবারবর্গকে আরেকটি গাধায় আরোহন করালেন।

অম্লান বদনে কায়রো থেকে চিরতরে বের হয়ে যাওয়ার এবং কোন অখ্যাত জনপদে বসবাস করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। যেহেতু তার ফাতওয়া শোনা হচ্ছে না, তাই তিনি সকলের থেকে পৃথক হয়ে যাবেন। কিন্তু উলামাদের মূল্য অনুধাবনকারী মিশরের জনগণ এ বিষয়টি মানতে পারল না।

শায়খের পিছনে পিছনে মিশরের হাজার হাজার আলেম, নেককার, ব্যবসায়ী, নারী-পুরুষ ও শিশুরাও বের হয়ে পড়ল। শায়খের সমর্থনে এবং তার বিরোধীদের প্রত্যাখ্যান করে। বাদশা নাজমুদ্দীন আয়্যুবের নিকট অসংখ্য সংবাদ পৌছতে লাগল।

বাদশা দৌড়ে এল শায়খ ইজ্জুদ্দীনের পিছ পিছ তাকে সন্তুষ্ট করাতে। কিন্তু শায়খ তো তার ফাতওয়া কার্যকর করার আগে রাজি হবেন না। তিনি বললেন:

> "তুমি যদি চাও, এ সকল আমিররা স্ব স্ব পদের অধিকারী হবে, তাহলে অবশ্যই প্রথমে এদেরকে বিক্রি করবে। অত:পর যে এদেরকে ক্রয় করবে, সে আযাদ করবে। আর যেহেতু পূর্বে এসকল আমিরদের মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে মুসলমানদের বায়তুল মাল থেকে, তাই এখন এদের বিক্রয় মূল্যও মুসলমানদের বায়তুল মালে ফেরত দিতে হবে।"

নাজমুদ্দীন আয়্যুব শায়খের কথায় একমত হল এবং এই বাহাদুর শায়খের কথার প্রতি নত হল, যিনি আল্লাহর ব্যাপারে কোন নিন্দুকের নিন্দাকে পরওয়া করেননি। শায়খ নিজেই সরাসরি আমিরদের বিক্রয়ের দায়িত্ব নিলেন, যাতে কোন ধরণের তামাশা না হয়।

শায়খ আমিরদেরকে একজনের পর একজন নিলামে উঠাতে লাগলেন এবং তাদের মূল্য বাড়াতে লাগলেন। জনগণও নিলামে অংশগ্রহণ করল। অবশেষে যখন মূল্য অনেক বেড়ে গেল, তখন বাদশা নাজমুদ্দীন তার ব্যক্তিগত মাল থেকে আমিরদেরকে ক্রয় করলেন। অত:পর আযাদ করে দিলেন।

আর উক্ত মাল বায়তুল মালে জমা করলেন। এভাবে ঐসকল আমিরদেরকে বিক্রি করা হল, যারা মন্ত্রণালয়, সচিবালয়, সামরিক বিভাগ ও অন্যান্য বিভাগে নেতৃত্ব দিত। সেদিন থেকেই শায়খ ইজ্জুদ্দীন ইবনে আব্দুস সালাম আমিরদের বিক্রিকারী নামে খ্যাতি লাভ করেন।

সায়্যিদ কুতুব রহঃ

শাসক জামাল আব্দুন নাসের যখন তাকে তার সেই মত থেকে ফেরাতে চেষ্টা করল, যা তিনি তার বিরুদ্ধে পোষণ করতেন, তখন তিনি তার সেই প্রসিদ্ধ উক্তিটি করেছিলেন:

> "যে শাহাদাত আঙ্গুল নামাযের মধ্যে আল্লাহর একত্ববাদের সাক্ষ্য দিয়েছে, তা এমন একটি অক্ষরও লিখতে পারবে না, যাতে তাগুতের শাসনকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।"

আমাদের যামানায় কত শায়খ ও আলেম এই হক কথাটির কারণে তাগুতদের কারাগারে বন্দী হয়ে আছেন!

উসামা বিন লাদেন রহ:

যিনি সেই সকল কুফরী জাতি ও তাগুতী শাসনব্যবস্থাসমূহের একমাত্র টার্গেট ও লক্ষ্য হয়ে গিয়েছিলেন, যারা হোয়াইট হাউসের 'পাহাদার কুকুরের ভূমিকা পালন করছে। আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি, আল্লাহ তাকে শহীদদের সাথে কবুল করুন।

যুগে যুগে যত মহা পুরুষগণ আল্লাহর দ্বীনের সাহায্যের জন্য কারারুদ্ধ হয়েছেন, হত্যার শিকার হয়েছেন, তাদের সকলের কথা যদি লিখতে যাই, তাহলে আমার মনে হয় না যে, আমি তাদের গুণে শেষ করতে পারবো। কারণ তাদের সংখ্যা কয়েকটি বই বা কয়েকটি খন্ডে লিখে শেষ করার চেয়েও বেশি।

আমি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি, আল্লাহ আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে ঐ সকল ব্যক্তিদের অন্তর্ভূক্ত করুন, যারা আল্লাহর দ্বীনের উপর অবিচল থেকেছেন এবং হিকমত ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে তার পথে ডেকেছেন।

পরিশেষে আমি বলবো: নিশ্চয়ই শক্তিমান মুমিন আল্লাহর নিকট দুর্বল মুমিন অপেক্ষা প্রিয় ও উত্তম। আর বীরত্ব এমনই একটি বৈশিষ্ট্য, একমাত্র ঐ সকল শক্তিমান লোকেরাই তাতে অলংকৃত হতে পারে, যারা স্বীয় দ্বীনের ব্যাপারে আত্মমর্যাদাশীল। কাপুরুষতা ও ভীরুতা যাদের পেশা নয় এবং ধ্বংসশীল দুনিয়ার প্রতি যারা ঝুকে পড়েনি।

তাই বীরত্ব মানুষের সাথে উদ্ভিদের ন্যায় বেড়ে উঠে, বৃদ্ধি পায়। যখন একজন ব্যক্তি তার প্রতি গুরুত্ব দেয়, তার যত্ন নেয় এবং তার হক যথাযথভাবে আদায় করে, তখন তা তার সাথে সাথে বেড়ে উঠে, বড় হয় এবং উক্ত ব্যক্তির মর্যাদা উচু হয়।

অষ্টম গুণ الشوري (পরামর্শ)

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

"(হে নবী!) তারপর আল্লাহর রহমতই ছিল, যদ্দরুণ তাদের প্রতি তুমি কোমল আচরণ করেছ। তুমি যদি রূঢ় প্রকৃতির ও কঠোর হৃদয় হতে, তবে তারা তোমার আশপাশ থেকে সরে বিক্ষিপ্ত হয়ে যেত।

সুতরাং তাদেরকে ক্ষমা কর, তাদের জন্য মাগফিরাতের দু'আ কর এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ করতে থাক। অত:পর তুমি যখন কোন বিষয়ে মন স্থির করবে, তখন আল্লাহর উপর নির্ভর কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওয়াক্কুলকারীদেরকে ভালবাসেন।"

'শুরা' এর আভিধানিক অর্থ পরামর্শ করা। যেমন যখন সকলে একটি বিষয়ে পরামর্শ করে, তখন বলা হয়- **صار هذاالأمر شوري بين القوم** (এই বিষয়টি সকলের পরামর্শক্রমে সম্পন্ন হয়েছে।) অর্থাৎ তাদের মনে যা যা উদয় হয়েছে, তারা তার ব্যাপারে পরস্পরে পরামর্শ করেছে, এতে তাড়াহুড়া করেনি।

আর পরিভাষাগত তাৎপর্য হচ্ছে, এটা ইসলামী শাসনব্যবস্থার মূল ভিত্তি। যে সকল বিষয় জীবনযাপন ও রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট; ওহী, শরীয়ত বা আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত কোন বিধানের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়, তার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা পরামর্শ করার আদেশ দিয়েছেন।

একজন মুসলিম নেতার জীবনে শুরা বা পরামর্শ একটি মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সমাজ, রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালনার ক্ষেত্রে এটাই ইসলামের নীতি। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কিতাবে এটা বিধিবদ্ধ করেছেন এবং তার নবীকে দু'বার এর ব্যাপারে আদেশ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতে বলেন:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

"এবং যারা তাদের রবের ডাকে সাঁড়া দেয়, নামায কায়েম করে, তাদের কার্যাদী সম্পন্ন হয় নিজেদের মাঝে পরামর্শক্রমে এবং সেই রিযিক হতে খরচ করে, যা আমি তাদেরকে দিয়েছি।" (শুরা:৩৮)

ইমাম শাফেয়ী রহ: বলেন: আবু হুরায়রা রা: বলেন:

> "আমি কখনো এমন কাউকে দেখিনি, যে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর চেয়ে অধিক নিজ সাথীদের সাথে পরামর্শ করে।"

এটা একই সাথে নেতা ও উম্মাহর জন্য পরামর্শের গুরুত্ব প্রমাণ করে। আমি এধরণের কয়েকটি গুরুত্বের কথা আলোচন করার চেষ্টা করবো, যা আল্লাহ আমার মনে ঢেলে দিয়েছেন:

১। একক রায়ের ফলে যে অহংকার, আত্মগর্ব ও আত্মপ্রবঞ্চনা সৃষ্টি হয়ে থাকে, শুরা বা পরামর্শ নেতাকে তার থেকে রক্ষা করে। একক সিদ্ধান্ত প্রদানকারী আত্মগর্বী হয়ে থাকে। সে ধারাণা করে, আল্লাহ তা'আলা সকল মুমিনদের মধ্য থেকে তাকে নির্বাচিত করেছেন স্বীয় হেদায়াত ও সঠিক রায়ের জন্য। সে ই আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্ত আর অন্যরা বঞ্চিত।

আর এটা, আল্লাহর শপথ! ধ্বংসাত্মক। দে আনাস ইবনে মালেক রা: থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

> "তিনটি জিনিস ধ্বংসাত্মক: তার মধ্যে একটি তিনি উল্লেখ করেছেন: কোন ব্যক্তির নিজের রায় নিয়ে তুষ্ট বা আত্মতৃপ্ত হওয়া।" (ইমাম বায্যার রহঃ তার মুসনাদে থেকে এটি বর্ণনা করেছেন।)

আর উম্মাহর উপর এর বিরূপ প্রতিক্রিয়াও অনুরুপ মন্দ। কারণ এই সিদ্ধান্ত মোতাবেক যে কাজটি করা হয়, তা হয় বরকতশুণ্য। কিন্তু এর বিপরীতে যদি পরামর্শ নিয়ে করা হয়, তাহলে আল্লাহ তাতে বরকত দান করেন।

২। তার প্রতি প্রজাদের ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হওয়া থেকে রক্ষা করে। কারণ নেতার একক সিদ্ধান্ত কার্যকর হওয়ার ফলে মুসলমানদের অন্তর থেকে এই উম্মাহকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অনুভূতি চলে যায়।

ফলে তাদের উপর যে অনিষ্ট ও আশঙ্ক আপতিত হয়, তারা তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না। কারণ তাদের তো কোন কর্তৃত্ব নেই। ফলে এটা তার ও মুসলিম জামাতের দুর্বলতার কারণ হয়।

আর এর বিপরীতে রয়েছে শক্তি, সাহায্য, ও সঠিক দিকনির্দেশ। কারণ পরামর্শ জাতি ও সমাজকে উন্নতির শিখরে নিয়ে যায়। সকলের মন ও চেষ্টা এক হয়। সৎ ও তাকওয়ার কাজে এবং আমার বিল মারুফ ও নেহী আনিল মুনকারের কাজে পরস্পরের সহযোগীতা হয়...।

৩। কখনো একক রায়ের কারণে নেতাকে গুনাহের ভার বহন করতে হয়, যদি সত্য থাকে তার কথার বিপরীতে। যদিও তার নিয়্যত ছিল নেক।

৪। পরামর্শ স্বেচ্ছাচারিতা, জুলুম ও মানুষের প্রতি অবজ্ঞা করা থেকে বিরত রাখে। আর এই শেষোক্তটিই ছিল ফেরাউনদের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা বলেন:

فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ

"এভাবেই সে নিজ সম্প্রদায়কে বেকুব বানাল এবং তারাও তার কথা মেনে নিল। প্রকৃতপক্ষে তারা সকলেই ছিল পাপিষ্ঠ সম্প্রদায়।" (যুখরুফ:৫৪)

আর শান্তিকামীরা মানুষকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করে, যেমনিভাবে আল্লাহ সম্মানিত করেছেন।

একারণেই নেতার জন্য পরামর্শ অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও ওয়াজিব। তবে যে ব্যাপারে অকাট্য অর্থবোধক ও অকাট্যভাবে প্রমাণিত শরয়ী বর্ণনা রয়েছে, সেগুলো ছাড়া। কারণ সেগুলোর ব্যাপারে শাসককেই দায়িত্বভার দেওয়া হয়েছে।

শুরার বাস্তবতা ও গুরুত্বের ব্যাপারে হযরত উমার রা: থেকে পূর্ণাঙ্গ ও তাৎপর্যবহুল উক্তি বর্ণিত আছে। তার ব্যাপারে বর্ণিত আছে, তিনি খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর তার প্রথম ভাষণে বলেন:

"জেনে রাখুন, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার মাধ্যমে আপনাদেরকে পরীক্ষায় ফেলেছেন এবং আপনাদের মাধ্যমে আমাকে পরীক্ষায় ফেলেছেন। তাই জেনে রাখুন, আপনাদের অংশ গ্রহণ ব্যতীত আমি একা এই দায়িত্ব বহন করতে পারবো না। তাই আপনারা আল্লাহর নিকট আমার জন্য এককটি প্রমাণ হবেন।

আমি বলতে চাচ্ছি, খেলাফতের যেসকল বিষয়ে আমি পরামর্শ করতে আদিষ্ট, নিশ্চয়ই আমি সে সকল বিষয়ে আপনাদের সাথে পরমার্শ করেছি। আমাদের মাঝে রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন। আসমানের বিষয়াদী নিয়ে তার নিকট ওহী অবতীর্ণ হত, যে ওহীর মাঝে সামনে পিছনে কোন দিক হতে বাতিল অনুপ্রবেশের সুযোগ ছিল না, এতদসত্ত্বেও আল্লাহ তার রাসূলকে পরামর্শ করতে আদেশ দিয়েছেন। অথচ তাকে ওহীর মাধ্যমে সাহায্য করা হত। তাহলে আমাদের জন্য তা কত প্রয়োজন।

আমাদের তো কোন নিষ্পাপত্ব নেই, যেমনটা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ছিল। আমরা মানুষ, আমরা আমাদের চিন্তা দিয়ে মতামত পেশ করি, তাতে কখনো ভুল করি, কখনো সঠিক করি।"

কোন ব্যক্তি যখন একক সিদ্ধান্ত দিয়ে ভুল করে আর সকল মানুষ তার উপর ক্ষেপে উঠে এবং বিপদাপদ তার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে, তখন এটা তার জন্য ও মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত লাঞ্ছনাকর হয়।

পক্ষান্তরে যখন পুরো জামাত মিলে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, অত:পর সিদ্ধান্তটি ভুল প্রমাণিত হয়, তখন দলীয়ভাবে সকলে পূর্বমত থেকে ফিরে আসবে। কোন একজন অভিযুক্ত হওয়া থেকে মুক্ত থাকবে। ফলে এটা জামাতের জন্য এবং শাসকের জন্য অধিক নিরাপদ হয়।

যে বিষয় পরামর্শ ছাড়া একজনের পক্ষ থেকে আবশ্যক করে দেওয়া হয়, তার মাঝে কোন কল্যাণ নেই। একক রায় হচ্ছে পুরনো সুতার ন্যায়, যা ছিড়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। আর দু'জনের রায় হচ্ছে দু'টি মজবুত সুতার ন্যায় আর তিনজনের রায় এমন একটি রশির ন্যায়, যা ছিড়া প্রায় অসম্ভব।

নেতার উচিত এই পরামর্শের জন্য এমন লোকদেরকে নির্বাচন করা, যারা ইলম, তাকওয়া, সততা ও সৎসাহসের ব্যাপারে পরিচিত। যাদের মেধা প্রখর, পক্ষপাতিত্ব ও কুপ্রবৃত্তি থেকে মুক্ত। তাই এ বৈশিষ্ট্য বহির্ভূত কাউকে পরামর্শের জন্য নির্ধারণ করবে না।

এমনিভাবে তিনি মুসলমানদের বিশেষ কোন দলের সদস্যদেরকে অন্যদের উপর প্রাধান্য দিবেন না। কারণ সবাই জানেন, এই সমস্যার কারণে আমাদের জাতির অবস্থা কতটা বিভক্তি ও বিচ্ছিন্নতার দিকে গিয়েছে! কত মতের প্রাধান্যতা সৃষ্টি হয়েছে!

সুতরাং দূরদর্শী নেতা তিনিই, যিনি প্রত্যেক জামাত থেকে উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যের লোকদেরকে নির্বাচিত করেন। এমনিভাবে সাধারণ মুসলিমদের থেকেও নির্বাচিত করেন। যাতে সকলে মিলে এমন একটি মতের দিকে যেতে পারেন, যাতে আল্লাহর সাহায্য ও দিকনির্দেশ থাকে। কোন মুসলমান তার বিরোধিতা না করে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মাঝে যুদ্ধ-সন্ধির অনেক ঘটনায় পরামর্শের আদর্শ রেখে গেছেন। তার এ ধরণের ঘটনাগুলোর মধ্যে রয়েছে:

১। বদর যুদ্ধে শত্রুর মুখোমুখী হওয়ার জন্য বের হওয়া এবং অবস্থান গ্রহণের স্থান নির্বাচন করার বিষয়ে স্বীয় সাহাবাদের সাথে পরামর্শ করা। তখন তিনি এই প্রসিদ্ধ উক্তিটি করেছিলেন:

হে লোক সকল! আমাকে পরামর্শ দাও। তারপর তিনি তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে অগ্রসর হন মুশরিকদের আগে বদরের পানি দখল করার জন্য এবং মুশরিকরা যাতে তাতে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে না ফেলে। তিনি বদরের পানির সবচেয়ে নিকটবর্তী স্থানে অবস্থান গ্রহণ করলেন।

এখানে এসে হুবাব ইবনুল মুনযির রা: একজন সমরবিশেষজ্ঞের ন্যায় দাঁড়িয়ে বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! এই স্থানটি কি আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন, নাকি একটি মত ও কৌশল মাত্র?

রাসূল ﷺ বললেন: " বরং একটি মত ও কৌশল মাত্র।"

তখন হুবাব রা: বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! এটা উপযুক্ত স্থান নয়। সকলকে নিয়ে চলুন, আমরা মুশকির বাহিনীর দিক থেকে সবচেয়ে নিকটবর্তী পানির স্থানে গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করি। তাহলে আমরা সেখানে অবস্থান গ্রহণ করে অন্যান্য কূপগুলো থেকে

তার পানি বিচ্ছিন্ন করে দিব। আর আমরা সেখানে একটি হাউজ খনন করে তাতে পানি ভরে রাখব। তারপর শত্রুর সাথে যুদ্ধ করলে আমরা পানি পাব আর তারা পানি পাবে না।

তখন রাসূল ﷺ বললেন: "তুমি একটি সুন্দর পরামর্শ দিয়েছ।" রাসূলুল্লাহ ﷺ হুবাবের মতামত ও পরামর্শ গ্রহণ করলেন। সৈন্য বাহিনী নিয়ে সেখান থেকে উঠে শত্রুদের থেকে সবচেয়ে নিকটবর্তী পানির নিকট অবস্থান গ্রহণ করলেন। অত:পর সেখানে একটি কূপ খনন করে অন্যান্য সকল কূপগুলো পানিশুণ্য করে দিলেন।

(সীরাতে ইবনে হিশাম)

২। বদরের বন্দীদের ব্যাপারে সাহাবাদের সাথে পরামর্শ। ইমাম মুসলিম রহ: হযরত উমার রা: থেক বদর যুদ্ধের ঘটনা প্রসঙ্গে একটি হাদিস বর্ণনা করেন। তাতে রয়েছে:

রাসূল ﷺ আবু বকর, আলী ও উমার রা:দের থেকে পরামর্শ চাইলেন। আবু বকর রা: পরামর্শ দিলেন: হে আল্লাহর রাসূল! এরা আমাদেরই ভাই, চাচা ও আত্মীয়-স্বজন। আমি মনে করি, এদের থেকে মুক্তিপণ নিয়ে এদেরকে ছেড়ে দেওয়া হোক। তাহলে তাদের থেকে যা পাব, সেটা কাফেরদের বিরুদ্ধে একটি শক্তি হবে আর অতিসত্তর তাদেরকেও আল্লাহ হেদায়াত দিতে পারেন, তাহলে তারাও আমাদের শক্তি হয়ে যাবে।

তারপর রাসূলূল্লাহ ﷺ বললেন: হে উমার তোমার মত কি? তিনি বললেন: আমি বলি, আল্লাহর শপথ! আবু বকর যা মনে করেন, আমি তা মনে করি না। বরং আমার মত হচ্ছে, আমাকে সুযোগ দিন, আমি ওমুকের (উমার রা:এর জনৈক নিকত্মীয়) গর্দান উড়িয়ে দেই।

আর আলীকে সুযোগ দিন, সে আকীলের গর্দান উড়িয়ে দেক। যাতে আল্লাহ জেনে যান যে, আমাদের অন্তরে মুশরিকদের ব্যাপারে কোন নমনীয়তা নেই। আর এরা হচ্ছে মুশরিকদের নেতা ও প্রধান।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকর রা: এর কথার দিকে ধাবিত হলেন। আমার কথার প্রতি ধাবিত হলেন না। তাদের থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করলেন।

অত:পর যখন পরবর্তী দিন আসল, (উমার রা: বলেন:)

"পরের দিন সকাল বেলা আমি রাসূল ﷺ ও আবু বকরের নিকট গেলাম। তারা কাঁদছেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কি কারণে আপনি ও আপনার সাথী ক্রন্দন করছেন? যদি আমারও কান্না পায়, তাহলে আমিও কাঁদবো, অন্যথায় আপনাদের কান্নার কারণে আমিও কান্নার ভান করবো।"

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: তোমার সাথীরা আমার নিকট মুক্তিপণ গ্রহণের যে প্রস্তাব পেশ করেছে, তার কারণে তোমাদের শাস্তি এই বৃক্ষটিরও নিকটে এসে গিয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করেছেন:

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"কোন নবীর পক্ষে এটা শোভনীয় নয় যে, সে যমীনে যতক্ষণ পর্যন্ত শত্রুদের রক্ত ব্যাপকভাবে প্রবাহিত না করবে (যাতে তাদের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে খতম হয়ে যায়), ততক্ষণ পর্যন্ত তার কাছে কয়েদী থাকবে। তোমরা দুনিয়ার সম্পদ কামনা কর আর আল্লাহ তোমাদের জন্য আখেরাতের কল্যাণ চান। আল্লাহ পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়।"

৩। ওহুদের যুদ্ধে তার সাহাবাদের সাথে পরামর্শ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

> আল্লাহর শপথ! আমি একটি উত্তম স্বপ্ন দেখেছি, আমি আমার তরবারীর মাথায় একটি ছিদ্র দেখতে পেলাম এবং আমি দেখতে পেলাম, আমি একটি মজবুত লৌহবর্মে আমার হাত প্রবেশ করিয়েছি। আমি তার ব্যাখ্যা করেছি, মদীনা। তাই তোমরা যদি চাও, তাহলে এটা করতে পার যে, তোমরা মদীনায়ই থাকবে।
>
> আর তাদেরকে আপন অবস্থায় ছেড়ে দিবে, তারা যেখানে ইচ্ছা অবস্থান গ্রহণ করবে। তারা যদি সেখানেই অবস্থান করে, তাহলে সেটা তাদের জন্য হবে মন্দ অবস্থান। আর যদি তারা মদীনায় প্রবেশ করে, তাহলে আমরা মদীনায় থেকেই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো।

আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুলের মতামতও ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺএর মতের অনুরূপ। সেও এই মতই পোষণ করত এবং বের হওয়াকে ভাল মনে করেনি। রাসূলুল্লাহ ﷺও বের হওয়া অপছন্দ করছিলেন।

কিন্তু মুসলমানদের মধ্য থেকে যে সকল সাহাবীগণ বদর যুদ্ধ শরীক হতে পারেননি এবং পরে ওহুদ ও অন্যান্য যুদ্ধগুলোতে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেছিলেন, তারা বলে উঠলেন:

> হে আল্লাহর রাসূল! আমাদেরকে আমাদের শত্রুদের দিকে বের করে নিয়ে চলুন। যাতে তারা এই ধারণা না করে যে, আমরা কাপুরুষ ও দুর্বল হয়ে পড়েছি।

তখন আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সলূল বলল:

"হে আল্লাহর রাসূল! মদীনায়ই থাকুন, তাদের দিকে এগিয়ে যাবেন না। আল্লাহর শপথ! যখনই আমরা আমাদের শত্রুদের দিকে বের হয়ে গিয়েছি, তখনই আমাদের শত্রুরা আমাদের পরাজিত করেছে আর যখনই শত্রুরা মদীনায় প্রবেশ করেছে, তখনই আমরা তাদেরকে পরাজিত করেছি। তাই হে আল্লাহর রাসূল! তাদেরকে আপন অবস্থায় ছেড়ে দিন।

তারা যদি সেখানেই অবস্থান করে, তাহলে সেটা হবে তাদের জন্য মন্দ অবস্থান আর যদি মদীনায় প্রবেশ করে, তাহলে আমাদের পুরুষরা তাদের সাথে মুখোমুখী হয়ে লড়াই করবে আর নারী ও শিশুরা উপর থেকে পাথর নিক্ষেপ করবে। আর যদি তারা ফিরে যায়, তাহলে যেভাবে এসেছে, সেভাবেই ব্যার্থ হয়ে ফিরে যাবে।"

তখন যেসকল সাহাবীগণের আগ্রহ ছিল শত্রুর উপর গিয়ে আক্রমণ করা, তারা বারংবার রাসূল ﷺ কে পীড়াপীড়ি করতে লাগল। ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ ঘরে গিয়ে যুদ্ধের পোষাক পরিধান করলেন। সেটা ছিল জুম্মার দিন জুম্মা নামাযের পর। সেদিনই মালেক ইবনে আমর নামে এক আনসারী সাহাবী মারা যান।

রাসূলুল্লাহ ﷺ জানাযা নামায পড়ে জনসম্মুখে আসলেন। ইতোমধ্যে লোকজন অনুতপ্ত হল। তারা বলতে লাগল, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বাধ্য করেছি। আমাদের জন্য এটা উচিত হয়নি। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাদের মাঝে গেলেন, তখন সকলে বলতে লাগল:

হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনাকে বাধ্য করেছি। আমাদের জন্য এটা উচিত হয়নি। তাই আপনি ইচ্ছা করলে এখানেই থাকতে পারেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: কোন নবীর জন্য যুদ্ধের পোষাক পরিধান করে ফেলার পর যুদ্ধ করার আগ পর্যন্ত তা খোলে ফেলা শোভনীয় নয়। অত:পর রাসূলুল্লাহ ﷺ **১** হাজার সাহাবী সমবিহারে বের হলেন। (সীরাতে ইবনে হিশাম)

৪। খন্দক যুদ্ধে সাহাবাদের সাথে পরামর্শ। সালমান ফারসী রা: বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমরা পারস্য দেশে ছিলাম। সেখানে আমরা অবরোধে পড়ে গেলে আমাদের চার পাশে পরিখা খনন করে নিতাম।

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺও তার সাথে একমত হলেন এবং এই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করলেন।

মদীনার চার পাশে পরিখা খনন করতে আদেশ দিলেন। সাহাবাদের মাঝে কার্যবন্টন সম্পন্ন হল। অত:পর অত্যন্ত হিম্মত ও সংকল্পের সাথে কাজ শুরু হল। যদিও তখন প্রচণ্ড শীত ও খাদ্যাভাব ছিল। উপরন্তু অবরোধকারী শত্রুদের সংখ্যাও ছিল অনেক বেশি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পরবর্তীতে সাহাবায়ে কেরাম, হযরত আবু বকর রা:কে খেলাফতের জন্য মনোনীত করার মাধ্যমে পরামর্শের তাৎপর্যকে আরো সুদৃঢ় করেন। কারণ কেবল জনগণেরই সকলের পরামর্শ ও সন্তুষ্টির মাধ্যমে খলীফা নিয়োগ দেওয়ার অধিকার রয়েছে। এই অধিকার হরণ করার অধিকার কারো নেই।

ইবনে আব্বাস রা: থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

আমি কয়েকজন মুহাজিরকে পড়াতাম। তাদের মধ্যে আব্দুর রহমান ইবনে আউফও ছিলেন। একদা আমি মিনায় তার বাড়ীতে ছিলাম আর তিনি তার সর্বশেষ হজ্জে উমার ইবনুল খাত্তাব রা: এর সাথে অবস্থান করছেন।

একবার আব্দুর রহমান সেখান থেকে ফিরে এসে আমাকে বললেন: তুমি যদি দেখতে, এক ব্যক্তি আমিরুল মুমিনীনের নিকট এসে বলল:

> হে আমীরুল মুমিনীন! অমুককে আপনি কি বলবেন; সে বলছে, উমার মারা গেলে আমি অমুকের হাতে বায়আত গ্রহণ করবো। কারণ আবু বকরের বায়আত তো আকস্মিকই সম্পন্ন হয়েছিল।

একথা শুনে উমার রা: ক্রোধান্বিত হলেন। তিনি বললেন:

> আমি ইংশাআল্লাহ বিকাল বেলা সকলের সামনে দাঁড়িয়ে সকলকে এসকল লোকদের সম্পর্কে সতর্ক করবো, যারা মানুষের অধিকার হরণ করতে চায়।

আব্দুর রহমান বলেন: তখন আমি বললাম:

> হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি এখন এমনটি করবেন না। কারণ এটা এমন একটি সময়, এখানে ইতর-ভদ্র বিভিন্ন শ্রেণীর অসংখ্য মানুষ একত্রিত হয়েছে। আপনি ভাষণ দিতে দাঁড়ালে তারাই সবার আগে আপনার নিকটবর্তী হয়ে থাকবে।
>
> ফলে আমার আশংকা হয়, আপনি দাঁড়িয়ে একটি কথা বলবেন, আর তারা সেটাকে আপনার থেকে নিয়ে সর্বত্র ছড়াবে। অথচ তা সঠিকভাবে স্মৃতিতে ধারণ করতে ও সঠিক স্থানে রাখতে পারবে না। তাই আপনি একটু অপেক্ষা করে মদীনায় গিয়ে তা বলুন। কারণ সেটা হিজরত ও সুন্নাহর দেশ। সেখানে বুঝমান ও সম্মানিত লোকদের সাথে একান্তে কথা বলতে পারবেন।
>
> ফলে আপনি যা বলবেন, তা দৃঢ়ভাবে বলতে পারবেন আর জ্ঞানী-গুণীরা আপনার কথাকে সঠিকভাবে স্মৃতিতে ধারণ করে সঠিক স্থানে রাখবে।

উমার রা: বললেন:

ইংশাআল্লাহ, মদীনার সর্বপ্রথম মজলিসেই আমি এ বিষয়ে কথা বলার জন্য দাঁড়াবো। ইবনে আব্বাস রা: বলেন: অত:পর যিলহজ্জ মাসের পরে আমরা মদীনায় প্রত্যাগমন করলাম। তারপর পরবর্তী জুম্মার দিন সূর্য হেলে যাওয়ার সাথে সাথে আমি দ্রুত রওয়ানা দিলাম।

সায়ীদ ইবনে যায়দ ইবনে আমর ইবনে নাওফিলকে দেখতে পেলাম মিম্বারের পিলারের নিকট বসে আছেন। আমিও তার পাশে এমনভাবে বসলাম যে, আমার হাটু তার হাটু স্পর্শ করছে। ক্ষাণিক পরেই দেখলাম, উমার ইবনুল খাত্তাব বের হয়েছেন। তাকে আসতে দেখে আমি সায়ীদ ইবনে যায়দ ইবনে আমর ইবনে নাওফেলকে বললাম: আজ বিকালে তিনি এমন একটি কথা বলবেন, যা খলীফা হওয়ার পর তিনি কখনো বলেননি।

সায়ীদ প্রত্যাখ্যান করে বললেন: মনে হয় না, এমন কিছু বলবেন, যা পূর্বে কখনো বলেননি। অত:পর উমার রা: মিম্বারে বসলেন। মুআয্যিনের আযান শেষ হওয়ার পর তিনি দাঁড়িয়ে আল্লাহর যথাযোগ্য প্রশংসা করলেন। তারপর বললেন:

আজ আমি এমন একটি কথা বলবো, যা আমাকে বলতেই হবে। আমি জানি না, হয়ত এটা আমার মৃত্যুর পূর্বক্ষণ। তাই যে কথাটি বুঝে সঠিকভাবে স্মৃতিতে ধারণ করতে পারবে, সে এটা সর্বত্র প্রচার করতে পারে। আর যার না বুঝার সম্ভাবনা রয়েছে, এমন কাউকে আমি আমার উপর মিথ্যা আরোপের অনুমতি দিচ্ছি না।

আমার নিকট সংবাদ পৌঁছেছে, আপনাদের একজন বলেছে: "আল্লাহর শপথ! যদি উমার মারা যায়, তাহলে আমি অমুকের হাতে বায়আত গ্রহণ করবো। আমি বলে দিচ্ছি, উক্ত ব্যক্তি যেন এই ভেবে প্রতারিত না হয় যে, আবু বকর রা: এর বায়আত আকস্মিক সংগঠিত হয়েছিল। কারণ সেটা যদিও এমন হয়েছিল, কিন্তু স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তার অনিষ্টকে প্রতিহত করেছিলেন।

আর আপনাদের কেউ এমন নেই, যার প্রতি সকলের গর্দান ততটা নত হবে, আবু বকরের প্রতি সকলের গর্দান যতটা নত হয়েছিল। যে ব্যক্তি সকল মুসলমানদের সাথে পরামর্শ ব্যতীত কারো হাতে বায়আত গ্রহণ করে, কেউ যেন উক্ত ব্যক্তির বা তার হাতে বায়আত গ্রহণকারীর অনুসরণ না করে। কারণ তাদের উভয়কে হত্যা করার আশংকা রয়েছে।

আল্লাহ যখন তার নবীকে উঠিয়ে নিলেন, তখন আমাদের নিকট সংবাদ পৌঁছলো যে, আনসারগণ আমাদের বিরোধিতা করে সকলে সাকীফায়ে বনী সায়ীদায় একত্রিত হয়েছে। আর আলী, যুবাইর ও তার সঙ্গীরা আমার বিরোধিতা করছে। আর মুহাজিরগণ সকলে আবু বকরের নিকট একত্রিত হয়েছে।

আমি আবু বকরকে বললাম, চলুন, আমরা আমাদের এসকল আনসার ভাইদের নিকট যাই। অত:পর আমরা আনাসদের উদ্দেশ্যে চললাম। আমরা তাদের কাছাকাছি হওয়ার পর তাদের দু'জন নেককার লোকের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হল। আমি দেখতে পেলাম সকল লোকজন আমাকে নিয়েই আলোচনা করছে।

উক্ত ব্যক্তিদ্বয় আমাদেরকে বললেন: হে মুহাজির সম্প্রদায়! আপনারা কোন্ দিকে যাচ্ছেন? আমি বললাম, আমরা আমাদের এসকল আনসার ভাইদের নিকট যাচ্ছি। তারা বলল: আপনারা তাদের নিকট যাওয়ার পূর্বে প্রথমে নিজেরা ঐক্যবদ্ধ হোন। আমি বললাম, আল্লাহর শপথ! আমরা অবশ্যই তাদের নিকট যাব। তারপর আমরা এগুতে এগুতে সাকীফায়ে বনী সাদিয়ায় পৌঁছলাম। সেখানে সকলের মাঝে চাদর পরিহিত একজন লোককে দেখতে পেলাম। আমি বললাম, এই ব্যক্তি কে? তারা বলল: সা'দ ইবনে উবাদা।

আমি বললাম: তার কি হয়েছে? তারা বলল: জ্বর। তারপর সকলে বসার পর তাদের বক্তা শাহাদাত ও আল্লাহর যথাযোগ্য প্রশংসা করার পর বলল:"আমরা আনসার, ইসলামের সৈন্যবাহিনী। আর আপনারা মুহাজিরের ক্ষুদ্র একটি দল। কিন্তু আপনাদের সম্প্রদায়ের কিছু লোক আমাদের ঐতিহ্য নষ্ট করে দিতে এবং আমাদের থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে এগিয়ে এসেছে"। সে যখন চুপ হল, তখন আমি কথা বলার ইচ্ছা করলাম।

আমি মনে মনে কিছু কথা সাজিয়েছিলাম, যা আবু বকরের সামনে উপস্থাপন করতে আমার আনন্দবোধ হচ্ছিল। আমি তার পক্ষ থেকে কিছু আক্রমণের জবাব প্রস্তুত করেছিলাম। কিন্তু আমি যখন কথা বলার ইচ্ছা করলাম, তখন আবু বকর বললেন: থাম! আমি তাকে ক্রোধান্বিত করতে চাইলাম না। তিনি কথা বলা আরম্ভ করলেন। তিনি ছিলেন আমার চেয়ে অধিক সহনশীল ও গুরুগম্ভীর। আল্লাহর শপথ! যে সাজানো গোছানো কথাগুলো আমার নিকট চমৎকার মনে হচ্ছিল, তিনি তাৎক্ষণিকই সেরূপ বা তার থেকেও উৎকৃষ্টমানের কথা বললেন। তারপর নীরব হলেন।

অত:পর আবার বললেন: "তোমরা তোমাদের মধ্যকার যে কল্যাণের আলোচনা করছিল, তোমরা তার যোগ্য বটে। কিন্তু এই খেলাফতের বিষয়টি এক মাত্র কুরাইশের জন্যই নির্ধারিত। তারাই বংশ মর্যাদা ও অবস্থানস্থলের দিক হতে আরবের সবচেয়ে মধ্যবর্তী ও শ্রেষ্ঠ। আমি তোমাদের জন্য এই দু'জনের যেকোন একজনকে বাছাই করছি। তোমরা এদের যেকোন একজনের হাতে বায়আত করো।"

অত:পর তিনি আমার ও আবু উবায়দার হাত ধরলেন। আর তিনি তখন আমাদের মাঝে বসা ছিলেন। তখন আমার নিকট তার একথাটিই সবচেয়ে অপছন্দ লাগল।

আল্লাহর শপথ! আমাকে যদি হত্যার জন্য পেশ করা হত, অত:পর আমার গর্দান এমনভাবে উড়িয়ে দেওয়া হত যে আমার কোন গুনাহই আর অবশিষ্ট থাকত না, তাহলে এটাও আমার নিকট সেই কওমের আমির হওয়া অপেক্ষা অধিক প্রিয় ছিল, যাতে আবু বকর বিদ্যমান থাকেন।

তবে যদি মৃত্যুর সময় আমার মনে এমন কোন জিনিস এসে পড়ে, যা এখন আমার মনে নেই, তাহলে সেটা ভিন্ন কথা। তখন জনৈক আনসারী বলল: আমি এর চূড়ান্ত সমাধান ও নিস্পত্তিমূলক কথা বলি: হে কুরাইশ সম্প্রদায়! আমাদের থেকে একজন আমির হবে, আর আপনাদের থেকে একজন আমির হবে। সঙ্গে সঙ্গে হট্টগোল ও তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়ে গেল। এমনকি তা বিশৃঙ্খলায় রূপ নিল।

তখন আমি বললাম: হে আবু বকর! আপনার হাত বাড়িয়ে দিন।

তিনি হাত বাড়িয়ে দিলে আমি তার হাতে বায়আত গ্রহণ করলাম। তারপর সমস্ত মুহাজিরগণ এবং অত:পর সমস্ত আনসারগণও তার হাতে বায়াআত গ্রহণ করল। আর আমরা সা'দ ইবনে উবাদার উপর চড়াও হলাম। একজন বলল: তোমরা সা'দ ইবনে উবাদাকে হত্যা করে ফেললে। আমি বললাম: আল্লাহ সা'দ ইবনে উবাদাকে হত্যা করেছে।

উমার বলেন: আল্লাহর শপথ! আমরা যে বিষয় নিয়ে উপস্থিত হয়েছে, তার মধ্যে আবু বকরের বায়আত থেকে শক্তিশালী কিছু আমরা দেখিনি। আমরা আশঙ্কা করছিলাম, লোকজন যদি আবু বকরের হাতে বায়আত গ্রহণ না করত, তাহলে লোকজন কারো হাতে বায়আত না করেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত।

ফলে হয়ত আমাদেরকে এমন কারো হাতে বায়আত গ্রহণ করতে হত, যার ব্যাপারে আমরা সন্তুষ্ট থাকতাম না, অথবা তার বিরুদ্ধাচরণ করতাম, ফলে নৈরাজ্য সৃষ্টি হত।

সুতরাং যে ব্যক্তি মুসলমানদের সাথে পরমার্শ ব্যতীত কারো হাতে বায়আত গ্রহণ করে, কেউ যেন উক্ত ব্যক্তির, বা সে যার হাতে বায়আত গ্রহণ করেছে তার অনুসরণ না করে। কারণ অচিরেই তাদেরকে হত্যা করা হতে পারে। (বুখারী মুসলিম।)

হযরত আবু বকর রা: এর মৃত্যু উপস্থিত হলে সমস্ত সাহাবাগণ তার নিকট একত্রিত হল এবং তিনি সকলের উদ্দেশ্যে নিজ মনের কথামালা ব্যক্ত করতে লাগলেন।

তিনি বললেন:

আল্লাহর ফায়সালা আমার সামনে উপস্থিত হয়েছে, যা তোমরা দেখতে পাচ্ছ। নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য এমন একজন লোক আবশ্যক, যে তোমাদের কার্যাদী দেখাশোনা করবে, তোমাদের সালাতের ইমামতি করবে, তোমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে এবং তোমাদের গনিমত বন্টন করবে।

অত:পর তিনি উমার রা:কে সকলের সামনে পেশ করলেন। তিনি একটি ভাষণ দিলেন, যাতে হযরত উমার রা: এর বৈশিষ্ট্যাবলীর বিবরণ তুলে ধরলেন। ফলে সকলে তার সিদ্ধান্ত মেনে নিল। যার সারকথা ছিল এই: তিনি (উমার) কঠোর, তবে জালিম নন। নম্র, তবে দুর্বল নন।

তালহা রা: আবু বকর রা: এর নিকট এই বলে তার খেলাফতের বিরুদ্ধে দলিল পেশ করেছিলেন যে: আপনি শক্ত ও কঠিন হৃদয়ের লোককে আমাদের উপর দায়িত্বশীল বানালেন। আপনি আপনার রবের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে কি জবাব দিবেন? কিন্তু পরবর্তীতে তার অবস্থা এই হয়েছে যে, তিনি নিজেই হযরত ওমরের শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দিয়ে তার উদ্দেশ্যে বলেন: *নিশ্চয়ই সমগ্র আরব আপনার হাতে সোজা হয়েছে এবং আপনার হাতেই আল্লাহ বিজয় দান করেছেন।*

অত:পর তিনিও উসমান ও আব্দুর রহমান ইবনে আউফের সাথে মিলে আবু বকর রা: এর নিকট ওমরের জন্য এই বলে খেলাফতের আবেদন করেন যে, তিনিই খেলাফতের জন্য সর্বাধিক যোগ্য।

অত:পর পরামর্শসভায় উপস্থিত অধিকাংশ সাহাবীই আমীরুল মুমিনীন হিসাবে ওমরের নেতৃত্বের ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেন। অত:পর সমস্ত উম্মাহও ওমরের হাতে বায়আত গ্রহণ করেন। যদি ওমরের প্রতি উম্মাহর বায়আত না থাকত এবং সকলে তার ব্যাপারে ঐক্যমত্য না হত, তাহলে কখনোই তার নেতৃত্ব বিশুদ্ধ হত না।

অগ্নিপুজক আবু লুলু (আল্লাহ তাকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করুন) যখন হযরত উমার রা:কে বর্শাঘাত করল, তখন তিনি নেতৃত্বের বিষয়টি ছয়জনের পরামর্শের উপর অর্পণ করেন। উসমান ইবনে আফ্‌ফান, আলী ইবনে আবি তালিব, তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ, যুবায়র ইবনুল আওয়াম, আব্দুর রহমান ইবনে আউফ ও সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা:।

আর আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ইবনুল খাত্তাব রা:কে বানালেন প্রধান্যতা নির্ধারণকারী। খেলাফতের ব্যাপারে তার কোন অধিকার থাকবে না। উমার রা: ওফাতের পর এই ক্ষুদ্র দলটি একত্রিত হল। আব্দুর রহমান ইবনে আউফ নিজেকে (খেলাফতের দাবি থেকে) মুক্ত করে নেন। ফলে তিনি বাকিদের প্রতিযোগীতা থেকে দূরে সরে যান।

আর তাদেরকে নিজের ব্যাপারে স্বাধীনতা দেন, তারা চাইলে মনোনয়নের দায়িত্ব তাকে দিতে পারেন। তারা এ প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রা:উপস্থিত সকল আনসার, মুহাজির ও সেনাবাহিনীর আমিরদের সাথে পরামর্শ করলেন। যারা উমার রা: এর সাথে তার মৃত্যুর পূর্ববর্তী হজ্জে উপস্থিত হয়েছিল।

তারপর উমার রা: যে ক্ষুদ্র দলটিকে নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন তাদের একেকজনের সাথে পৃথক পৃথকভাবে মিলিত হলেন। তাদের পারস্পরিক পরামর্শ ও তর্ক-বিতর্কের পর সর্বশেষ পর্যায়ে মনোনয়নের বিষয়টি উসমান ও আলী রা:এর মাঝে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। তারপর তিনি মদীনাবাসী প্রত্যেকের ঘরে ঘরে, এমনকি নারী-শিশুদের সাথে সাথেও পরামর্শ করেন।

তাতে তিনি বুঝতে পারলেন, মুসলমানগণ ওসমানের প্রতি ঝুকছে। ওসমানের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত স্থির হয়ে যাওয়ার পর আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রা: আলী রা: এর উদ্দেশ্যে বলেন: হে আলী! আমি মানুষের অবস্থা দেখেছি। আমি দেখছি, তারা ওসমানের সমকক্ষ কাউকে মনে করে না। তাই তুমি নিজের বিরুদ্ধে কোন পথ তৈরী করো না। ফলে আলী ইবনে আবি তালিব রা: এবং সমস্ত সাহাবা ও মুসলিমগণ পরামর্শ ও সন্তুষ্টির মাধ্যমে ওসমানের হাতে বায়আত গ্রহণ করেন।

উম্মাহর নেতৃত্ব এমন নীতির উপর চলাই আবশ্যক। পরামর্শের সেই প্রকৃত তাৎপর্য ফিরিয়ে আনা আবশ্যক, যা কামড়ে থাকা রাজত্ব ও জুলুমের শাসনের কারণে উম্মাহ থেকে বিদায় নিয়েছে।

আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি, তিনি মুসলিমদের জন্য এমন কাউকে প্রেরণ করুন, যিনি উম্মাহকে আল্লাহর কিতাব ও তার রাসূলের সুন্নাহ অনুযায়ী পরিচালিত করবেন, মুসলমানদের কাতারকে এক করবেন, তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করবেন।

বর্তমানে আমাদের জাতি ঐ সকল নেতাদের দ্বারা বিভিন্নভাবে পিষ্ট হচ্ছে, যারা কেবল নিজেদের খেয়াল খুশিকেই বিশ্বাস করে। তাদের অবস্থার ভাষা হল

مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ

"আমি তো কেবল সে পথই তোমাদেরকে দেখাই, যেটা আমি সঠিক মনে করি আর আমি তোমাদেরকে সঠিক পথই প্রদর্শন করি। (গাফির:২৯)

তাদের মধ্যে রয়েছে এ সকল ধর্মনিরপেক্ষ তাগুত শাসকগোষ্ঠী। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ধার্মিকতার দাবি করে। কিছু আবেগ প্রবণ মুসলিমকে এই ভুল ধারণা দেয় যে, তার নেতৃত্ব লাভের একমাত্র উদ্দেশ্য হল আল্লাহর শরীয়ত বাস্তবায়ন করা এবং তার দ্বীনের সাহায্য করা। এভাবে সে নিজেকে এবং তার দলবলকে ইসলামের অভিভাবকরূপে দাঁড় করায়। অথচ প্রকৃতপক্ষে মুসলিমদের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই।

এখানে তাদের সকল অনৈতিকতাগুলো আলোচনা করা আমাদের লক্ষ্য নয়। আমরা এখানে শুধু পরামর্শের বিষয়টি আলোচনা করবো। কারণ এটাই শাসন ব্যবস্থার ভিত্তি। এসকল শাসকরা পরামর্শের প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপই করে না।

তারা ধারণা করে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এমন বিশেষ বৈশিষ্ট্য দান করেছেন, যা বিশ্বের অন্য কাউকে তিনি দান করেননি বা করবেনও না। প্রথম শ্রেণীর শসকরা, তথা তাগুত ও আইন প্রণয়নকারীরা তো তাদের জনগণের চেহারাই পাল্টে ফেলেছে এবং তাদেরকে সর্বপ্রকার উপহাসের পাত্র বানিয়েছে।

রাষ্ট্রের সর্বপ্রকার বিষয়াদী নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখেছে। কেউ এ ব্যাপারে তাকে কোন প্রশ্ন করতে পারবে না। আর কেউ তাকে প্রশ্ন করবে কিভাবে? কারণ সে তো সব বিষয়ে বিশ্বের সকল মানুষের চেয়ে জ্ঞানী...... জেনে রাখুন, তারাই সকল মানুষের চেয়ে অধিক অজ্ঞ হওয়ার উপযুক্ত।

কিন্তু তারা শক্তি ও ক্ষমতার অপব্যবহার করে তাদের ভিত্তি সুদৃঢ় করে। আর এক্ষেত্রে তাদের সহযোগী হল তাদের প্রজাগণ। হ্যাঁ, হত্যা, নির্যাতন ও দারিদ্র্যের আশংকায় জনগণ কর্তৃক দুর্বলতা, আনুগত্য ও হীনতা মেনে নেওয়ার মাধ্যমে তাদের সহযোগীতা হয়। যেমনটা কুরআনে এসেছে:...

قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ

"যদি আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে উপাস্যরূপে মেনে নাও, তাহলে তোমাকে কারারুদ্ধদের অন্তর্ভূক্ত করবো।" (আশ-শুআরা:২৯)

আর তাদের সহযোগী হল, এ যুগের যাদুকররা। তাদের সংখ্যা অনেক। তারা বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করে। যেমন ধর্মের বা মিডিয়ার রূপ, লেখক, শাস্ত্রবিদ বা বিশিষ্ট্য ব্যক্তিবর্গের রূপ।

ব্যাপকভাবে সাধারণ ও অজ্ঞ মানুষকে পথভ্রষ্ট করা এবং তাদেরকে শাসকদের পুজায় লিপ্ত করার ক্ষেত্রে এই শ্রেণীর লোকদের বড় ভুমিকা রয়েছে। যেমনটা করেছিল আসহাবুল উখদুদের যাদুকররা। তারা মানুষকে আল্লাহর ইবাদত থেকে বিচ্যুত করে শিরক ও গোমরাহীর মধ্যে নিমজ্জিত করেছিল।

নিশ্চয়ই খলীফা মনোনয়ন কেবল মুসলমানদের পরামর্শ ও সন্তুষ্টির মাধ্যমেই হয়। আমাদের এই যুগেও এটা গ্রহণযোগ্য নয় যে, কোন দল বা জামাত আত্মপ্রকাশ করবে আর মুসলমানদের সাথে পরামর্শ বা তাদের সন্তুষ্টি ব্যতীত নিজেকে খলীফার আসনে বসাবে। কারণ খলীফা হল উম্মাহর সকল কার্যাবলী পরিচালনার ব্যাপারে আমানতদার।

আর কোন ব্যক্তি, দল বা গোত্রের জন্য কাউকে ইমাম হিসাবে মেনে নেওয়া এবং মুসলমানদের সাথে পরামর্শ ও তাদের সন্তুষ্টি ব্যতিত তাকে সমস্ত মুসলমানদের উপর কতৃত্বশীল বানিয়ে দেওয়ার কোন অধিকার নেই। যখন নামাযের ইমামতির জন্য ইমামের প্রতি মুসল্লিদের সন্তুষ্টি আবশ্যক হয়, তখন মুসলমানদের সেই ইমাম বা খলীফার প্রতি তো মুসলমানদের সন্তুষ্টি অবশ্যই আবশ্যক হবে, যে অচিরেই মুসলমানদের সকল কল্যাণ-অকল্যাণের বিষয় দেখাশোনা করবে।

আর উক্ত ইমামের উপর আবশ্যক হল, তার উপর মুসলমানদের যে আস্থা রয়েছে সে অনুযায়ী কাজ করা এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তার সাহাবাদের পরামর্শের নীতির অনুরসণ করা।

ইরবায ইবনে সারিয়া রা: থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: র

> *রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে এমন উপদেশ দিলেন, যাতে সকলের হৃদয় কেঁপে উঠল, চক্ষু অশ্রুতে প্লাবিত হল। আমরা বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! মনে হচ্ছে এটা বিদায়ী উপদেশ! তাই আমাদেরকে শেষ অসিয়ত করুন! তিনি বললেন:*

“আমি তোমাদেরকে আল্লাহর ভয়, শ্রবণ ও আনুগত্যের উপদেশ দিচ্ছি। অত:পর বললেন: তোমাদের মধ্যে যারা আমার পরে জীবিত থাকে, তারা অনেক মতবিরোধ দেখতে পাবে। তখন তোমরা আমার সুন্নাহ ও আমার পরবর্তী হেদায়াত প্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদার সুন্নাহ আকড়ে ধরবে। মাড়ির দাঁত দ্বারা তা আকড়ে থাকবে” । সুতরাং যে এ ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নাহ ও তার সাহাবায়ে কেরামের সুন্নাহ থেকে পলায়ন করে, সে ইমাম বা খলীফা নয়। যদিও সে নিজেকে খলীফা বলে উপাধি দেয়। আর যে নীতি অবলম্বনের মাধ্যমে এই অনুসরণের সূচনা হবে, তা হচ্ছে পরামর্শ। এটা অবশ্যই করতে হবে। যদিও আমরা বর্তমান স্বেচ্ছাচারী শাসকদের থেকে এটা প্রত্যক্ষ করি না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

তোমাদের মাঝে নবুওয়াত থাকবে, যতদিন আল্লাহ চান তা থাকুক। অত:পর যখন আল্লাহ তা উঠিয়ে নিতে চাইবেন, তখন তা উঠিয়ে নিবেন। তারপর আসবে খেলাফত আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহ। যতদিন আল্লাহ চান তা থাকুক, ততদিন তা থাকবে। অত:পর যখন আল্লাহ তা উঠিয়ে নিতে চাইবেন, তখন উঠিয়ে নিবেন।

তারপর আসবে কামড়ে থাকা রাজত্ব। যতদিন আল্লাহ চান তা থাকুক, ততদিন তা থাকবে। অত:পর যখন তা উঠিয়ে নিতে চাইবেন, তখন উঠিয়ে নিবেন। তারপর আসবে স্বেচ্ছাচারি শাসন।

অত:পর যতদিন আল্লাহ চান, তা থাকুক, ততদিন তা থাকবে। অত:পর যখন আল্লাহ তা উঠিয়ে নিতে চাইবেন, তখন উঠিয়ে নিবেন। তারপর আসবে খেলাফত আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহ। এই বলে তিনি চুপ রইলেন। (বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমাদ)

রাসূলুল্লাহ ﷺ কাউকে খলীফা মনোনীত না করেই মারা গেছেন। যেন উম্মাহ নিজেই নিজেদের খলীফা নির্ধারণ করে এবং সকলে তার ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ থাকে। আর আল্লাহর সেই বিধান বাস্তবায়িত হয়-“তাদের কার্যাদী সম্পন্ন হয় তাদের পারস্পরিক পরামর্শের মাধ্যমে” ।

আর যেন এটা পরবর্তীদের জন্য আদর্শ হয়। আয়েশা রা: বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ এমতাবস্থায় পরলোকগমন করেছেন যে, কাউকে খলীফা বানিয়ে যাননি। তিনি যদি কাউকে খলীফা বানিয়ে যেতেন, তাহলে অবশ্যই আবু বকর বা উমারকেই খলীফা বানাতেন। (বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমাদ)

আমাদের যামানায় আমরা আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদের সাহসী ভূমিকা ও পরামর্শের নমুনা পেশ করতে পারি মোল্লা মুহাম্মদ উমার রহ: কে দিয়ে। যখন আমেরিকা ইমাম উসামা বিন লাদেন রহ: কে আমেরিকান গোয়েন্দা বাহিনীর হাতে সমর্পণ করার দাবি জানায়, তিনি তখন গণ্যমান্য ও পরামর্শদাতা ১ হাজারেরও অধিক আলেমকে জমা করেন।

পরামর্শে আলেমগণ এটাকে নাজায়েয বলেন। মোল্লা মুহাম্মদ উমারও এটাকে সমর্থন করত: আমেরিকার আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাকে মর্যাদাবান করেন। তিনি তার সঙ্গী ও জনগণকে নিয়ে তাগুতদের মোকাবেলায় দৃঢ় ও অবিচল থাকেন।

আমাদের যুগের তাগুতরা তাদের জনগণের সাথে মহিষপালের রাখালের অনুরূপ আচরণ করে। যেমন, লক্ষ লক্ষ মহিষ হলেও রাখাল একাই সবগুলোকে পরিচালনা করে এবং চলার পথ নির্ধারণ করে।

পাঠক! মহিষপালকে আপনি দেখে থাকবেন, যখন স্থান ত্যাগ করার সময় হয়, তখন রাখাল একটি পয়েন্ট নির্ধারণ করে দেয়, যে পথ ধরে অপর পারে যাওয়ার জন্য অনেক সময় নদীও অতিক্রম করতে হয়। ফলে প্রতিটি মহিষ রাখালের নির্ধারিত সে পথ ধরেই যায়।

আর কুমির এসে সেই পয়েন্টে দাড়িয়ে থাকে, অত:পর সেখান দিয়ে অতিক্রমকালে অনেক মহিষকে ধরে খেয়ে ফেলে। মহিষের পাল যদি এ বিষয়টি লক্ষ্য করত, তাহলে অবশ্যই এ ক্ষতি হ্রাস করার জন্য পথ পরিবর্তন করত।

কিন্তু তারা তাদের রাখালকে একক কর্তৃত্বের অধিকারী বানিয়ে দিয়েছে। ফলে এ স্থানেই তাদের অনেকের সমাধি হয়। যদিও মহিষপাল বা এরূপ প্রাণীর জন্য এমনটা সঠিক, কিন্তু নেতৃত্ব দানকারী মুসলিম জাতির জনগণের জন্য এটা জায়েয হবে না।

নবম গুণ: الصدق সততা

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গে থাক।"

আভিধানিকভাবে 'সিদ্ক' অর্থ: সত্য কথা বলা। অতীতকালে হোক, ভবিষ্যৎকালে হোক। শত্রু হোক বা অন্য কেউ হোক। এটা কেবল সংবাদমূলক কথাবার্তায় হয়।

পরিভাষায়: 'সিদ্ক' হল গোপন-প্রকাশ্য ও জাহির-বাতিন একরকম হওয়া। যেন বান্দার অবস্থা তার কাজকে এবং তার কাজ তার অবস্থাকে মিথ্যা প্রমাণিত না করে।

সিদক বা সততা প্রকৃত মুমিনের গুণ। আর এতেও কোন সন্দেহ নেই যে, মানুষের মাঝে এ গুণে গুণান্বিত হওয়ার সর্বাধিক উপযুক্ত ব্যক্তি হল নেতা বা শাসক। কারণ আল্লাহ তাকে যে স্থানে অধিষ্ঠিত করেছেন, সে অবস্থানে এর প্রয়োজন অত্যধিক। কারণ আল্লাহর তাওফীক ও সাহায্য ছাড়া তার এক মুহূর্তও চলা সম্ভব নয়।

আর কোন মিথ্যাবাদীর পক্ষে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য আসাটা সৃষ্টিজীবের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলারর সুপ্রতিষ্ঠিত নীতির বিরোধী। এমন ব্যক্তির ভাগ্যে তো শুধু আল্লাহ রহমত থেকে বঞ্চনাই জুটবে, যদিও কিছুকাল পরে হয়। সুতরাং যে কাজের মাঝে মিথ্যা অনুপ্রবেশ করেছে, যার কর্তা কথা, কাজ বা নিয়্যতে মিথ্যা অবলম্বন করেছে, কখনো দেখবেন না যে, উক্ত কাজে বরকত লাভ হয়েছে।

কিন্তু কখনো এদের পক্ষেও কিছু আবর্তন ঘটবে এবং আল্লাহ তা'আলা তার নেককার বান্দাদেরকে যে সকল প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তারাও তার কিছু লাভ করবে বা এজাতীয় আরও কিছু ঘটবে; কিন্তু তা সাময়িক সময়ের জন্য।

আর এটা আল্লাহর বিশেষ হিকমতের কারণে, যা কেবল তিনিই জানেন। যারা সত্যবাদী নয়, আল্লাহ তাদেরকে কোন কল্যাণ বা ক্ষমতা দেন না।

তাই সমগ্রীকভাবে এ সকল সত্যবাদীদের জিহাদ ও নেক আমলের কারণেই আল্লাহ তা'আলা দেশ ও মানুষের বহুবিদ কল্যাণকর বিষয়াবলী ঘটান। কখনো তার ফলাফল বহুকাল যাবত অব্যাহতও রাখেন, যেমনটা আমরা আল্লাহ তা'আলার স্থির নীতির মাধ্যমে জানতে পেরেছি। এজন্য নেতাই এই মহান গুণে গুণান্বিত হওয়ার সর্বাধিক উপযুক্ত।

নেতাকে প্রথমে তার রবের সাথে সত্যবাদী হতে হবে। আল্লাহর সাথে সততা আর তার প্রতি একনিষ্ঠতা দু'টি ভিন্ন জিনিস। তবে পরস্পরের মাঝে আবশ্যিক সম্পর্ক রয়েছে। সততা হয় আবেদন বা আকঙ্খার ক্ষেত্রে, আর ইখলাস বা একনিষ্ঠতা হয় কাঙ্খিত বিষয়ের ক্ষেত্রে।

ইবনুল কায়্যিম বলেন:

> সততা ও ইখলাসের মাঝে পার্থক্য হল: বন্দার কিছু আকাঙ্খা ও কিছু কাঙ্খিত বিষয় থাকে। ইখলাস হল কাঙ্খিত বিষয়টি শুধু আল্লাহর জন্য হওয়া। আর সততা হল আকাঙ্খাটি শুধু আল্লাহর জন্য হওয়া।

সুতরাং ইখলাস হল কাঙ্খিত বিষয়টি বিভাজ্য না হওয়া। আর সততা হল আকাঙ্খাটি বিভাজ্য না হওয়া। তাই সততা হল চেষ্টা ও পরিশ্রম করা।

আর ইখলাস হল কাঙ্খিত লক্ষ্যটি একক হওয়া। একারণে নেতাকে পূর্ণ চেষ্টা করতে হবে এবং সর্বসাধ্য ব্যায় করতে হবে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি নিজের মধ্যে বাস্তবায়ন করার ব্যাপারে। এটাই হল আকাঙ্খার মধ্যে সততা। আর এ লক্ষ্যে পৌছার জন্য নেতার উচিত, কোন উপকরণের প্রতি ঝুকে না পড়া বা তা নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে না পড়া।

এটা হল আল্লাহর সাথে সততার দিক। আর আল্লাহই প্রকৃত তাওফীকদাতা। এটাই মূল বিষয়। কেননা বান্দা যদি তার রবের সাথে সততা দেখাতে পারে, তাহলে সে স্বীয় প্রজাদের সাথেও সততা দেখাতে পারবে।

নেতার উচিত স্বীয় কথায় সত্যবাদী হওয়া এবং কাজকর্মে আমানতদার হওয়া। জাতির হিসাবের মধ্যে কারো প্রতি শৈথিল্য না করা। আল্লাহর ব্যাপারে কোন ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনাকে ভয় না করা। স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি, মতামত, নীতি ও পথ অবলম্বন করা। তার চরিত্র ও আচার-আচরণই তার সততার প্রমাণ দিবে।

উম্মাহর সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখবে, যদিও এতে তার অনেক সময় ব্যায় করতে হয় ও পরিশ্রম করতে হয়। কাউকে উপেক্ষা করবে না। উম্মাহকে ধোঁকা দিবে না। এমন ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি দিবে না, যার ব্যাপারেও সে নির্বিকার; নিজ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চালায় না। প্রকৃত নেতা সে ই, যে স্বীয় উম্মাহর সম্মান ও গৌরবোজ্জল ইতিহাস ফিরিয়ে আনে। উম্মাহর প্রত্যাশার কেন্দ্রবিন্দু হয়।

জনগণ কর্তৃক নেতাকে ভালবাসা এবং তার পাশে ভেড়ার ক্ষেত্রে শাসকের সততার ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। আর এমনটা তো হবেই। যেহেতু তারা দেখছে, সে কখনো তাদের সাথে মিথ্যা বলেনি, তাদেরকে ধোঁকা দেয়নি, প্রতারিত করেনি। আর কোন সন্দেহ নেই যে, এই জনগণই তার সাহায্যকারী হবে এবং তার পিছনে থাকবে। কখনো তাকে সপে দিবে না, তার সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করবে না বা তার সহযোগীতা ছেড়ে দিবে না।

পক্ষান্তরে যদি সে মিথ্যার ব্যাপারে পরিচিত হয়, তাহলে ধারণার চেয়েও দ্রুত সময়ে তার রাজত্বের ভীত ধক্ষসে পড়বে, যদিও পূর্বোক্ত ছয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

"আচ্ছা, সেই ব্যক্তি উত্তম, যে আল্লাহভীতি ও তার সন্তুষ্টির উপর নিজ গৃহের ভিত্তি স্থাপন করেছে, না সেই ব্যক্তি, যে তার গৃহের ভিত্তি স্থাপন করে এক খাদের পতনোন্মুখ কিনারায়। ফলে সেটি তাকে নিয়ে জাহান্নামের আগুনে পতিত হয়। আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে হেদায়াতপ্রাপ্ত করেন না।" (তাওবা: ১০৯)

সততা সমাজের বন্ধন দৃঢ় করে, তার মাঝে ভারসাম্যতা আনয়ন করে। ফলে দুনিয়ার কোন কিছুই তাকে টলাতে পারে না। কোন ফেৎনাই তার মাঝে অনুপ্রবেশ করতে পারে না।

নিশ্চয়ই সততা হল মানুষকে আল্লাহর দিকে পরিচালনাকারী নবীদের একটি বৈশিষ্ট্য। হেদায়াতের নবী মুহাম্মদ ﷺ নবুওয়াত লাভের পূর্বেই 'সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত' উপাধি লাভ করেছিলেন। ফলে তার জাতি তার আনিত বিষয়ের ব্যাপারে তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা সত্ত্বেও অন্য সকল বিষয়ে তাকে বিশ্বাস করত।

সায়ীদ ইবনে জুবায়র রহঃ ইবনে আব্বাস রা: থেকে বর্ণনা করেন:

> একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ সাফা পাহাড়ে আরোহন করলেন। অত:পর তার কওমকে লক্ষ্য করে বললেন: হায় প্রভাতি আক্রমণ! ফলে কুরাইশের সকল লোক জমা হল। তারা তাকে বলল: আপনার কি হয়েছে? তিনি বললেন: তোমরা বল তো! আমি যদি তোমাদেরকে সংবাদ দেই: তোমাদের শত্রুরা সকাল বেলা বা বিকাল বেলা তোমাদের উপর আক্রমণ করবে, তাহলে কি তোমরা আমাকে বিশ্বাস করবে না?
>
> তারা বলল: অবশ্যই। তখন তিনি বললেন: তাহলে আমি তোমাদেরকে আসন্ন আযাবের সম্পর্কে সতর্ক করছি। আবু লাহাব বলে উঠল: ধ্বংস তোমার! তুমি আমাদেরকে এজন্য একত্রিত করেছো?! তখন আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করলেন: تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ "আবু লাহাবের দু' হাত ধ্বংস হোক!..." (বর্ণনা করেছেন ইমাম নাসায়ী রহ:)

রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কওমকে জিজ্ঞেস করার পর তার কওম যা বলেছিল, আমরা তার মাধ্যমে দলিল পেশ করছি। তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন: তোমরা বল তো, আমি যদি তোমাদেরকে সংবাদ দেই যে, তোমাদের শত্রুরা সকাল বেলা বা বিকাল বেলা তোমাদের উপর আক্রমণ করবে, তাহলে তোমরা আমাকে বিশ্বাস করবে না?

আর তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে পূর্বে যেমনটা অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল, সে হিসাবেই উত্তর দিয়েছে: হ্যাঁ। অর্থাৎ তারা তার উক্ত কথায় তাকে সত্যায়ন করেছে। নেতাকেও এমন গুণেই সজ্জিত হতে হবে। যেন তার শত্রু-মিত্র সকলেই তাকে সত্যবাদী বলে বিশ্বাস করে। শত্রুরাও কখনো তার থেকে মিথ্যা দেখতে না পায় এবং বন্ধুরাও না।

ফলে তার কথা নির্দ্বিধায় সত্য; মিথ্যার লেশ মাত্র নেই। অতএব সততা হল নববী চরিত্রের একটি মহান বৈশিষ্ট্য। এটি এমন একটি ভিত্তি, যা তাকওয়াকে অবশ্যম্ভাবী করে। সুতরাং যে ই আল্লাহর দ্বীনের সাহায্যের জন্য কাজ করে, তার জন্য এ বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্টমন্ডিত হওয়া অত্যাবশ্যক।

قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

"আল্লাহ বলবেন, এটা সেই দিন, যেদিন সত্যবাদীদেরকে তাদের সততা উপকৃত করবে। তাদের জন্য রয়েছে এমন সব উদ্যান, যার তলদেশে নহর প্রবাহমান। তাতে তারা সর্বদা থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। এটাই মহা সাফল্য।" (মায়িদা:১১৯)

রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সাহাবীদেরকে সততার প্রতি উৎসাহ দিতেন। ইবনে মাসউদ রা: থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

> তোমরা সততাকে আকড়ে ধর। কেননা সততা নেক কাজের পথ দেখায় আর নেক কাজ জান্নাতের পথ দেখায়। বান্দা সত্য বলতে থাকে এবং সত্যকে অন্বেষণ করতে থাকে, অবশেষে আল্লাহর নিকট সিদ্দীক হিসাবে তার নাম লিখিত হয়। আর তোমরা মিথ্যা থেকে বেচে থাক।
>
> কারণ মিথ্যা পাপাচারের পথ দেখায়। আর পাপাচার জাহান্নামের পথ দেখায়। বান্দা মিথ্যা বলতে থাকে এবং মিথ্যা অন্বেষণ করতে থাকে। অবশেষে আল্লাহর নিকট তার নাম কায্যাব (মিথ্যাবাদী) হিসাবে লিখিত হয়। (বর্ণনা করেছেন ইমাম বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী প্রমুখ)

পরিশেষে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক।